কোরআনের আলোকে

নামাযের মহাজাগতিক রহস্য

এই বইটি যদি কেউ আপনাকে উপহার দেন, তাহলে বুঝতে হবে যে তিনি আপনার জন্য সুন্দর পরকাল কামনা করেছেন।

কোরআনের আলোকে

নামাযের

মহাজাগতিক রহস্য

এবং তার অলৌকিকত্বের প্রমাণ

এস. এম. জাকির হুসাইন

জ্ঞানকোষ প্রকাশনী

বাংলাবাজার, ঢাকা।

প্রকাশক

জ্ঞানকোষ প্রকাশনী ৩৮/২-ক

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

ফোন: ৭১১৮৪৪৩, ০১৭১২৭১৭১৮

প্রথম প্রকাশ:

ফেব্রুয়ারী ২০০৬, একুশে বই মেলা

দ্বিতীয় প্রকাশ :

মে ২০০৯

পুনঃমুদ্রণ:

সেপ্টেম্বর ২০১৬

প্রচ্ছদ:

বাপ্পি আশরাফ

কম্পোজ রিয়াজুল ইসলাম (রিয়াজ)

এস. এস. পাবলিসার্স

ঢাকা।

ISBN: 984-70277-0038-1

মূল্য : ১০০ টাকা মাত্র।

উৎসর্গ:

নূর মোহাম্মদ আশেকুজ্জামান

(রাজশাহী)

এই বইয়ের মাধ্যমে যদি কোনো পূণ্য অর্জিত হয়, তাহলে আল্লাহ তা তোমাকে দান করুন। আমি তোমার কাছে দোয়প্রার্থী। আমার সাথে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করার ইচ্ছা ক’র না। তাতে কোনো গুরুত্ব নেই। বরং আল্লাহকে খোঁজ। আমি নিজেই সেই পথের পথিক।

লেখকের অন্যান্য বইঃ

আমেরিকা থেকে প্রকাশিতঃ

Secret Death and New Life

[www.amazon.com এ পাওয়া যাচ্ছে। লেখক বা বইয়ের নাম ধ'রে search করুন।]

বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত

ধ্যানের শক্তি ও নবজীবন

গোপন মৃত্যু ও নবজীবন

ধ্বংসাত্মক ধ্যান

অন্ধকারের বস্ত্রহরণ (১ম ও ২য় খণ্ড): বৈজ্ঞানিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সৃজনশীলতার রাজ্যে এক গোপন অভিযান

নারীর মনঃ নারী মনস্তত্ত্বের রহস্যময় দিকগুলি নিয়ে একটি ব্যতিক্রমধর্মী তত্ত্বীয় গ্রন্থ

কল্পকণা (কবিতা)

সৃষ্টিকর্তা সত্যিই আছেন!: Field Theory of the Absolute.

আজকের নেতাঃ সফল নেতৃত্বের শত কৌশল

বক্তৃতার ব্যাকরণ

কোরআনের আলোকে প্রাণের প্রাগৈতিহাসিক উৎস এবং মানব মনের গুপ্ত রহস্য

কোরআন এবং জেনেটিক্সঃ সৃষ্টির এক গূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটিত

কোরআনের অলৌকিক উচ্চারণ এবং তার শক্তির রহস্যঃ একটি আয়াত কেন পাহাড় টলাতে পারে

ইত্যাদি

কোরআনিক রেফারেন্স

আল্লাহর নামের মারেফত এবং ফজিলত

কোরআনের আলোকে

নামাযের

মহাজাগতিক রহস্য

এবং তার অলৌকিকত্বের প্রমাণ

আমরা এখন যা আলোচনা করতে যাচ্ছি তা মূলত কোনো বিতর্ক-প্রধান আলোচনা নয়। বরং তা হলো উদ্‌ঘাটন-প্রধান। অর্থাৎ আমরা এমনকি কোনো হাদিসকে ব্যবহার না ক'রেই পুরোপুরি কোরআনের আলোকে নামাযের মনস্তাত্ত্বিক আধ্যাত্মিক এবং মহাজাগতিক রহস্যাবলি পর্যালোচনা করার চেষ্টা করব যে, নামায রসূল (স.) এর নিজের আবিষ্কৃত কোনো আধ্যাত্যিক অনুষ্ঠান নয়, যার কারণে তাকে বিকৃত করার কোনো অবকাশ নেই। বরং তা স্বয়ং আল্লাহ্ তায়ালার তরফ থেকে আমাদেরকে প্রদত্ত শ্রেষ্ঠতম উপহার।

নামায নিয়ে অনেক বই পুস্তক রচিত হয়েছে। এবং ইসলাম ধর্মে যেমনটি আশা করা হয়, তেমনভাবে অধিকাংশ তথ্যসমৃদ্ধ বইতে নামায সম্পর্কে কোরআন এবং হাদিসে যা বলা হয়েছে, তার আলোকেই তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এযাবৎ কালে ইসলামে নামায সম্পর্কে যত বই পুস্তক রচিত হয়েছে তাদেরকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগের মধ্যে পড়ে সেই সব বই-পুস্তক যেগুলিতে বর্ণিত হয়েছে নামায কী, কিভাবে তা পড়তে হয়, কোরআনে সেই বিষয়ে আর কী বিধি-নিষেধ এবং আর কী নিয়ম-কানন দেয়া হয়েছে, তা। দ্বিতীয় শ্রেণীর বই গুলিতে নামাযের মারেফত নিয়ে আলোচনার নিদর্শন পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর বই আবার দুই ভাগে বিভক্ত। এক ভাগে নামাযের মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক, তথা জীবনের সর্বস্তরে কী কী উপকারিতা রয়েছে, তা বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে বৈজ্ঞানিক, অভিজ্ঞতালব্ধ এবং পর্যবেক্ষণজাত তথ্যের আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়। আর এক জাতের বই রয়েছে যেগুলোতে দাবি করা হয়েছে যে, তাতে নামাযের আধ্যাত্মিক পরিচয় এবং রহস্যাবলি আলোচিত হয়েছে। এই শ্রেণীর বই-পুস্তকে এই মতবাদও দেয়া হয়েছে যে, নামায বাহ্যিক অর্থে যে আধ্যাত্মিক অবকাঠামোতে অস্তিত্বশীল, তা আসলে সেরূপ নয়। এরূপ বইতে বলা হয় যে, নামায হলো মূলত আল্লাহ্‌র সঙ্গে যোগাযোগ এবং সেই যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার জন্যে মুসলমানগণ যেভাবে নামায প'ড়ে থাকেন সেভাবে নামায পড়ার কোনো প্রয়োজন নেই। যা হোক, এ বিষয়ে অনেক বিতর্ক রয়েছে। নামায সম্পর্কিত authorized বই-পুস্তকেও নামায আদায় করার নিয়মকানুনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিভেদ নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। আমরা নামায সম্পর্কিত এই সব আলোচনায় প্রবেশ করব না। আমরা প্রথমেই ধ'রে নিচ্ছি যে নামায কিভাবে পড়তে হয় তা আমরা সবাই জানি। সেই

পড়ার পদ্ধতির মধ্যে হাদিসের রকমারিতা অনুযায়ী সামান্য কিছু হেরফের থাকতে পারে, তবে তা বর্তমান নিবন্ধের আলোচনার আওতায় পড়ে না। আমরা শুরুতেই এই বিশ্বাস নিয়ে এগোতে চাই যে, যে-সব নিয়মাবলি অবলম্বন ক'রে নামায পড়া উচিৎ ব'লে কোরআনে এবং হাদিসে বলা হয়েছে, এবং মুসলমাদের মধ্যে দীর্ঘকাল ধ'রে অবিকৃত অবস্থায় যে ভাবে তা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে, তা সেভাবেই সত্য এবং সেভাবেই অনুষ্ঠিত করা আবশ্যক। নামাযের সম্পর্কে আমাদের আচরণবিধির ব্যাপারে এই কারণে আমাদের কোনো বিতর্ক নেই। এবং আমরা এখন যা আলোচনা করতে যাচ্ছি তা মূলত কোনো বিতর্ক-প্রধান আলোচনা নয়। বরং তা হলো উদ্‌ঘাটন-প্রধান। অর্থাৎ আমরা এমনকি কোনো হাদিসের ব্যবহার না ক'রেই পুরোপুরি কোরআনের আলোকে নামাযের মনস্তাত্ত্বিক আধ্যাত্মিক এবং মহাজাগতিক রহস্যাবলি পর্যালোচনা করার চেষ্টা করব। এবং এই বিষয়টিকেই আমরা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করব যে, নামায রসূল (স.) এর নিজের আবিষ্কৃত কোনো আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান নয়, যার কারণে তাকে বিকৃত করার কোনো অবকাশ নেই। বরং তা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার তরফ থেকে আমাদেরকে প্রদত্ত শ্রেষ্ঠতম উপহার।

তবে 'নামায বা সালাত কাকে বলে?' আমরা যাদি এই প্রশ্ন দিয়ে আলোচনা শুরু করি, তাহলে আমরা ঠিক এই মুহূর্তেই আক্ষরিকভাবে তার কোনো চূড়ান্ত জবাব দিতে পারব না; যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা নিবন্ধের শেষে পৌঁছাচ্ছি ততক্ষণ পর্যন্ত

নামায হলো আল্লাহ্‌র সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টা মানসিক হোক বা শারিরীক হোক বা উভয়ই হোক। সহী অর্থে নামায পড়লে তা নামায এবং সহী অর্থে নামায না পড়লে তাও নামায। উদ্দেশ্যটাই জানিয়ে দেয় কী করতে চাওয়া হয়েছিল। আমরা যেভাবে আল্লাহ্‌র সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ স্থাপন করতে চাই, ঐ ভাবটিকেই নামায ব'লে চিহ্নিত করা হচ্ছে। কিন্তু সে নামাজ গৃহীত হচ্ছে কি না, সেটি ভিন্ন কথা।

নামায কাকে বলে সে ব্যাপারে আমরা যদি কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসি, তা হলে তা হবে নিছক অনুমান। নামায যাকেই বলা হোক, যেহেতু সেই ভাবে তাকে আমরা সত্য ব'লে ধ'রে নিয়েছি যেভাবে তা বহাল রয়েছে, সেহেতু আমরা যা কিছু অনুসন্ধান করছি তার মাধ্যমে যদি কোনো তথ্য বা রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারি, তা দ্বারা নামাযের আবয়বিক বা কাঠামোগত কোনো পরিবর্তনের তত্ত্ব প্রস্তাবিত হবে না, বরং আমরা যখন প্রশ্ন করছি 'নামায?' তখন একেবারেই মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিকেই প্রশ্নটি করছি, যেন তা যে অবস্থায় আছে তাকে সে অবস্থায় রেখে এবং বিশ্বাস ক'রে এবং পালন ক'রে আমরা তা *কেন পালন করা উচিৎ* তার রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারি। সূরা **আনফাল** আয়াতের ৩৫ এ আল্লাহ্‌ বলেছেন:

কাবা ঘরের কাছে তাদের নামায শিষ দেয়া এবং তালি বাজানো ছাড়া অন্য কিছুই ছিল না।

একটু লক্ষ করলেই আমরা বুঝতে পারব যে আল্লাহ এখানে 'নামায' শব্দটিকেই ব্যবহার ক'রে উদ্দেশ্যহীনভাবে শিস দেয়া এবং তালি বাজানোর ঘটনাকে চিহ্নিত করেছেন। আল্লাহ বলছেন না যে তা নামায নয়। বরং তিনি বলছেন যে তাদের 'নামায' ছিল এ রকম।

এই কথা থেকে খুব স্পষ্টভাবেই বুঝা যাচ্ছে যে, *নামায হলো আল্লাহ্র সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের প্রচেষ্টা।* এই প্রচেষ্টা মানসিক হোক বা শারীরিক হোক বা উভয়ই হোক। সহী অর্থে নামায পড়লে তা নামায এবং সহী অর্থে নামায না পড়লে তাও নামায। উদ্দেশ্যটাই জানিয়ে দেয় কী করতে চাওয়া হয়েছিল। আমরা যেভাবে আল্লাহ্র সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ স্থাপন করতে চাই, ঐ ভাবটিকেই নামায ব'লে চিহ্নিত করা হচ্ছে। কিন্তু সে নামায গৃহীত হচ্ছে কি না, সেটি ভিন্ন কথা।

এবার আমরা একটু ইতিহাসের দিকে নজর দিই। আল্লাহ রসূল (স.) কে আগে থেকেই নবী হিসেবে মনোনীত ক'রে রেখেছিলেন। উপযুক্ত সময় যখন এসে গেল তখন তিনি তার কাছে ওহী পাঠালেন। ওহী পাঠানোর ঠিক অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তিনি তাঁকে সশরীরে তার আরশ ভ্রমণে যাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। তিনি সেখানে গেলেন। তাঁর মধ্যে এবং আল্লাহ্র মধ্যে যোগাযোগ হলো। ভাব বিনিময় হলো। কথাবার্তা বিনিময় হলো। বাক্য বিনিময় হলো। তারপর তিনি সেখান থেকে ফিরে এলেন। তিনি আসার পথে সপ্তম আসমানে মুসা (আ.) এর সঙ্গে দেখা করলেন বা তাদের মধ্যে দেখা হলো। তখন মুসা (আ.) তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আল্লাহ্ তোমাকে কী বললেন? তিনি নামাযের ব্যাপারটি বললেন। তখন মুসা (আ.) বললেন, পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায! এ তোমার উম্মতরা পারবে না। তুমি যাও, আবার আল্লাহকে বল, কিভাবে নামাযের

আল্লাহ্র সঙ্গে রসূল (স.) এর দেখা হলো। তিনি তাঁকে সশরীরে তাঁর দরবারে ডেকে নিয়ে গেলেন। তাঁর বাড়িতে, তাঁর ঘরে। রসূল (স.) মেহমান হয়ে তাঁর কাছে গেলেন। সারা পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি সম্মানিত মেহমান, সর্ব যুগের শ্রেষ্ঠ মেহমান। অথচ আল্লাহ্ উপহার হিসেবে তাঁকে একটি এটম বোমা, দুইটি পিস্তল, কয়েক মাইল লম্বা একটি সোনার তরবারি, কোনো খেতাব ইত্যাদি দিবেন কি, তা না ক'রে তিনি তাঁকে উপহার হিসেবে দিলেন *নামায!*

সংখ্যা কমানো যায় দেখ। এভাবে আল্লাহর কাছে বার বার ফেরত দিয়ে তিনি কামনা করলেন যে তাঁর উম্মতের জন্য নামাযের সংখ্যা যেন কমানো হয়। এমন ভার যেন তাদের ওপর না চাপে যা তারা বইতে পারবে না। অবশেষে আল্লাহ্ দয়াপরবশ হয়ে মুসলমানদের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আদেশ করলেন।

যা হোক, এই ঘটনা আমরা সবাই জানি। আমাদের বর্তমান আলোচনার লক্ষ্য ঠিক ঘটনাটি নয়। আমরা যে জিনিসটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে চাচ্ছি তা অন্য কিছু। আমরা এটি যদি দৈনন্দিন জীবনে যে common sense বা সাধারণ ধারণা ব্যবহার ক'রে অন্যের তথা পৃথিবীর সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় রত হই, এক্ষেত্রেও শুধুমাত্র সেটুকুই ব্যবহার করি, তাহলেও

একটি অত্যন্ত বিস্ময়কর ঘটনা লক্ষ করব। আল্লাহ্‌র সঙ্গে রসূল (স.) এর দেখা হলো। তিনি তাঁকে সশরীরে তাঁর দরবারে ডেকে নিয়ে গেলেন। তাঁর বাড়িতে, তাঁর ঘরে। রসূল (স.) মেহমান হয়ে তাঁর কাছে গেলেন। সারা পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি সম্মানিত মেহমান, সর্ব যুগের শ্রেষ্ঠ মেহমান। অথচ আল্লাহ্‌ উপহার হিসেবে তাঁকে একটি এটম বোমা, দুইটি পিস্তল, কয়েক মাইল লম্বা একটি সোনার তরবারি, কোনো খেতাব ইত্যাদি দিবেন কি, তা না ক'রে তিনি তাঁকে উপহার হিসেবে দিলেন *নামায*!

এবং আরো মজার বিষয় হলো, সেই উপহার শুধু তাঁর জন্য নয়, তাঁর গোটা উম্মতের জন্য। আল্লাহ রসূল (স.) এর উম্মতের ওপর একটি 'দায়িত্ব' চাপালেন, অথচ তিনি বললেন যে সেটি হলো সেটি 'উপহার'। এবং সে উপহার আমরা এখন দলে দলে অস্বীকার করছি, গ্রহণ করতে চাচ্ছি না! কত কষ্ট হয় নামায পড়তে! কত অনীহা জাগে! কিভাবে আমরা তা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি! আর এই বিষয়টিকেই না *উপহার* হিসাবে চিহ্নিত করা হলো! এর মর্ম আমরা বুঝি কি না বুঝি, সেটি ভিন্ন কথা, তবে এই সংবাদটির তাৎপর্য না বুঝেই এর peculiarity বা বিশেষত্বের প্রতি লক্ষ রেখে অবাক হওয়ার সুযোগটি আমরা পেতে পারি।

নামায উপহার হলো কিভাবে? উপহার তো হয় এমন জিনিস যার জন্যে আমরা ততক্ষণ উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করতে থাকি যতক্ষণ আমাদের কাছে তা এসে না পৌঁছায়, এবং যখন আমাদের কাছে এসে তা পৌঁছায়, তখন আমরা তা লুফে নিয়ে যারপরনাই আনন্দিত হই। কিন্তু এ *কেমন* উপহার?

প্রিয় পাঠক! নামায *কেন শ্রেষ্ঠ* উপহার, *কী অর্থে* তা উপহার, ঠিক এই মুহূর্তে তা বোঝার কোনো প্রয়োজন নেই। শুধু এটুকু অনুভব করার চেষ্টা করুন যে, তা *উপহার।*

এই মুহূর্তে বরং যেটুকু প্রয়োজন, তা হলো *অবাক হতে পারা।* যে বিষয়টিকে উপহার হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে *স্বয়ং আল্লাহ্‌র* তরফ থেকে, তার প্রিয় বন্ধুর হাতে তিনি নিজেই যা তুলে দিয়েছিলেন, নিশ্চয়ই তা সাধারণ, সাদামাটা কোনো উপহার নয়। অন্তত এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নামাযকে চিহ্নিত করতে পারাই জীবনের একটি বড় সার্থকতা। নামায যদি এমন কিছু হবে যা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ মুহূর্তটিতে উপহার হিসেবে দেয়া যেতে পারে, তাহলে তা নিশ্চয়ই এমন কোনো সাদামাটা জিনিস নয় যা হিসেবে তাকে আমরা বিবেচনা ক'রে থাকি। আর এ কারণেই এই নিবন্ধে আমরা *কোরআনের তথ্যের* আলোকে তার কিছু গূঢ় রহস্য উদঘাটনের চেষ্টা করব। ইনশাল্লাহ!

সব নবীর উম্মতদের জন্যই আল্লাহ নামায দিয়েছিলেন। এ কথা আল্লাহ্‌ পবিত্র কোরআনেই বলেছেন। তবে আমরা ইসলামের গণ্ডির মধ্যে থেকে যখন তা নিয়ে কথা বলি তখন সব প্রসঙ্গে 'সালাত' বা 'নামায' শব্দটি বারবার ব্যবহার করার কারণে হয় আমরা নিজেরাই তার মর্ম বুঝতে পারি না, না হয় অন্যের ধর্মের অনুসারী যারা তারাই বিরক্ত হন, এবং ভাবেন যে আমরা সবকিছুকে আমাদের শব্দগুচ্ছ এবং তত্ত্ব ব্যবহার ক'রেই ব্যাখ্যা করতে চাচ্ছি, এবং একচেটিয়াভাবে সবার ওপর চাপিয়ে দিচ্ছি। তাদের কথা না হয় বাদ দিলাম, আমরাই যে বিষয়টিকে ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় বুঝতে পারি না, এটি হলো আসল কথা। হয়তো কোনো নবীর উম্মতের জন্য তা *ধ্যান* আকারে এসেছে, কোনো নবীর উম্মতের জন্য তাতে শুধু *রুকু* ছিল, কোনো নবীর উম্মতের জন্য শুধু *সিজদা* ছিল, কোনো নবীর উম্মতের জন্য ছিল *উভয়ই*, ইত্যাদি। আমরা এমন ধর্মও দেখেছি যেখানে মানুষ সিজদা করে। যেমন ভারতবর্ষের হিন্দু [সনাতন] নামক ধর্মের বিভিন্ন শাখায় এখনও পর্যন্ত উপুড় হয়ে শুয়ে পুরো দেহটিকে মাটির সঙ্গে মিলিয়ে মাথাটিকে নাক বরাবর মাটির সঙ্গে মিশিয়ে নত ক'রে সিজদা করার উপায়। চীন এবং জাপানে অতীত প্রচলিত কিছু ধর্মে এই প্রথা প্রচলিত ছিল।

ইসলাম নামক এই সর্বশেষ ধর্মে আল্লাহ নামায হিসেবে আমাদেরকে যে আধ্যাত্মিক আচরণ-কাঠামোটি দান করেছেন, তাতে রুকু সিজদা আবৃত্তি ধ্যান মুখোমুখি সংলাপ ছালাম সবই অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। এ থেকে আমরা একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারি যে, পূর্বযুগের সমুদয় ধর্মের সমুদয় আচরণবিধি ইসলামের এই একটি আধ্যাত্মিক অথচ দৈনন্দিন আচরণের মধ্যে বাঁধা পড়েছে।

জাপানীদের আচরণে আমরা এখনও দেখি যে তারা রাজা-বাদশা বা সম্মানিত ব্যক্তিদের কাছে গিয়ে তাদেরকে সম্মান করার সময়ে রুকুর মতো ভঙ্গি করে। আল্লাহ কোরাআনে বলেছেন, কিছু ফেরেশতা রয়েছেন যাঁরা শুধু সিজদায় রত, কিছু ফেরেশতা রয়েছেন যারা শুধু রুকুতে রত, কিছু ফেরেশতা রয়েছেন যাঁরা তাসবিহ্ তাহলিলে মগ্ন।

ইসলাম নামক এই সর্বশেষ ধর্মে আল্লাহ্ নামায হিসেবে আমাদেরকে যে আধ্যাত্মিক আচরণ-কাঠামোটি দান করেছেন, তাতে রুকু সিজদা আবৃত্তি ধ্যান মুখোমুখি সংলাপ ছালাম সবই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ থেকে আমরা একটু চিন্তা করলে বুঝতে পারি যে, পূর্বযুগের সমুদয় ধর্মের সমুদয় আচরণবিধি ইসলামের এই একটি আধ্যাত্মিক অথচ দৈনন্দিন আচরণের মধ্যে বাঁধা পড়েছে।

এখন আমরা পবিত্র কোরআনের কিছু নির্বাচিত আয়াত পর্যালোচনা ক'রে তার মধ্য থেকে নামায সম্পর্কিত গূঢ় সংবাদগুলি উদ্ধার করবার চেষ্টা করব। এই কাজ আমরা বিশেষ কোনো পরিকল্পনা সহকারে তত্ত্বীয় বিভাজন কিংবা শ্রেণীকরণের আওতায় এনে সমাধা করার চেষ্টা করব না। মূলত যা আমরা পুরোপুরি বুঝি না, তাকে শ্রেণীকরণ করতে গেলেই সেক্ষেত্রে আমাদের অজ্ঞতা এসেই সে কাজকে প্রভাবিত করবে। তা ছাড়া , আমরা যেহেতু নামাযের অবকাঠামো-বিষয়ক আলোচনায় রত হচ্ছি না, সেহেতু আমাদের আলোচনায় সেরূপ কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করার প্রয়োজন হবে না, যা আলোচনাকে পরিশীলিতভাবে একটি বিশেষ নিয়মের মধ্যে ফেলে উপস্থাপন করে।

আল্লাহ্ বলেছেন:

> *তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর এবং বিনীতগণ ছাড়া আর সকলের নিকট নিশ্চিতভাবে এ কাজ কঠিন। তারাই বিনীত যারা বিশ্বাস করে যে তাদের প্রতিপালকের সাথে নিশ্চিতভাবে তাদের সাক্ষাৎকার ঘটবে এবং তাঁরই দিকে তারা ফিরে যাবে।*

(সুরা **বাকারা** আয়াত ৪৫, ৪৬)

এখানে আল্লাহ্ বলছেন- তোমরা আমার কাছে যখন সাহায্য প্রার্থনা করার প্রয়োজন হয় তখন সাহায্য প্রার্থনা কর। তবে *উপায়* হিসাবে তিনি দেখিয়ে দিচ্ছেন *ধৈর্য্য* এবং *সালাতকে*। ধৈর্য কাকে বলে? এ বিষয়ে আমি বিভিন্ন প্রবন্ধে আলোচনা

করেছি। এখানে শুধু এটুকুই বলতে পারি যে, আমার মন কোনো একটি ঘটনা ঘটুক ব'লে কামনা করছে, এবং সে জন্যে অস্থির হয়েছে, এবং সে ঘটনা না ঘটার কারণে আমি কষ্ট পাচ্ছি। অথচ এরূপ অবস্থায় আমি আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা ক'রে আমার জন্যে যা কিছু ঘটছে তা সঠিক এবং মঙ্গলজনক ব'লে বিশ্বাস ক'রে এবং আমার মন যা চাচ্ছে তা চাওয়া সত্ত্বেও যে সে যা তা পাচ্ছে না- এই না-পাওয়াটিই আমার জন্যে সুখকর এবং মঙ্গলজনক, এই বিশ্বাস ক'রে না-পাওয়া নিয়ে তৃপ্ত থাকা। একেই বলে ধৈর্য। এই ধৈর্য এবং সালাতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌ সাহায্য প্রার্থনা করতে বলেছেন। কথাটি অত্যন্ত সহজ

যে কাজ আমি আমার দেহ-মনকে ব্যবহার ক'রে করতে পারি, তা না ক'রে রাজার হালে সিংহাসনে ব'সে আকাশ বাতাস ফেরেশতা কিংবা কোনো কিছুকে আদেশ করা মানেই হলো অহংকার। আর এই অহংকারের ঠিক বিপরীত হলো বিনয়।

এবং এ বোঝার জন্য খুব বেশি চিন্তা করার দরকার হয় না। আল্লাহ বলেছেন-তোমরা মানসিকভাবে ধৈর্য অবলম্বন কর এবং যে সাহায্য প্রয়োজন তা সালাতের মাধ্যমে চাও। তিনি বলেননি যে নামায পড়ার *পরে* প্রার্থনা কর কিংবা প্রচুর ধৈর্য ধ'রে প্রার্থনা কর এবং তার পরে নামায পড়। তিনি ধৈর্য *এবং* সালাতকেই অবলম্বন করতে বলেছেন। এবং তার পরই ব'লে দিচ্ছেন যে, যারা *বিনয়ী* তারা ছাড়া অন্যদের নিকট এ কাজ অত্যন্ত কঠিন।

কাকে বলে *বিনয়?* সেক্ষেত্রে আল্লাহ্‌ নিজেই ব'লে দিচ্ছেন-যারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস রাখে যে তাদের সঙ্গে আল্লাহ্‌র দেখা হবে, তারা আল্লাহ্‌র মুখোমুখি হবে, তারাই বিনয়ী। কেন এভাবে বলা হচ্ছে? আমরা কি কখনও 'বিনয়' কে এভাবে বিবেচনা ক'রে দেখেছি?

এখন, কাকে বলে, *বিনয়?* সেক্ষেত্রে আল্লাহ্‌ নিজেই ব'লে দিচ্ছেন-যারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস রাখে যে তাদের সঙ্গে আল্লাহ্‌র দেখা হবে, তারা আল্লাহ্‌র মুখোমুখি হবে, তারাই বিনয়ী। কেন এভাবে বলা হচ্ছে? আমরা কি কখনও 'বিনয়' কে এভাবে বিবেচনা ক'রে দেখেছি? একটু ভেবে দেখা যাক। আমি মনে করি যে আল্লাহর সঙ্গে আমার দেখা হবে, তাহলে তখন আমার মনের অবস্থা কী হবে। তখন আমার জীবনে যে পরিস্থিতিই আসুক, আমি আমার আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে তাল মিলিয়ে সেই পরিস্থিতির সঙ্গে প্রতিক্রিয়ায় রত হতে পারব না। কারণ আমার খেয়াল থাকবে যে, আমি যদি এখন যাচ্ছে-তাই বলি বা করি বা ভাবি, তাহলে এক সময়ে আল্লাহ্‌র সামনে আমাকে লজ্জিত হতে হবে। এই লজ্জাবোধ আমার আবেগের আকস্মিকতা ও আঞ্চলিক তীব্রতাকে নামিয়ে দেয়। ফলে আমার কিছু চাইতে ইচ্ছে করলেও ঠিক যা-ইচ্ছে তা চাইতেও আমার মন চায় না। একটি পরিস্থিতিতে অস্থির হতে আমার মন চাইলেও লজ্জায় আমার অস্থিরতা অবনত হয়ে যায়। এবং 'আমি আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি' এই কথা যখন আমার নিজেরই স্মরণে আসবে, তখন যদি আমার এ কথাও একই সঙ্গে স্মরণে থাকে যে আমি যাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি এক সময়ে তাঁর সঙ্গেই আমার দেখা হবে, তাহলে আমি যে ব্যাপারে সাহায্য প্রার্থনা করছি সে ব্যাপারে আর একটু ভেবে দেখব।

যেমন, ধরা যাক আমার সামনের টেবিলে এক গ্লাস পানি রয়েছে। আমি যদি এখন কামনা করি যে ঐ পানির গ্লাসটা আমার কাছে উড়ে চ'লে আসুক, এবং সে উদ্দেশ্যে আমি ধৈর্য ধরি, কামনা করতেই থাকি, এবং নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র কাছে

সাহায্য চাই, তাহলে সেই সাহায্য আল্লাহ্‌র তরফ থেকে আসবে কি না তা পরের কথা, সেই সাহায্যটিকে আমি আদৌ কামনা করতে পারতাম কি না, যদি আমি বিবেচক হতাম, যদি আমি ভদ্র হতাম, যদি আমি একথা স্মরণে রাখতাম যে, যাঁর কাছে আমি এই ক্ষুদ্র কাজের জন্য সাহায্য চাচ্ছি তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হবে, সেটিই প্রথমে বিবেচ্য। যেখানে আমি এক পা হেঁটে গিয়ে একটি হাত ব্যবহার ক'রেই পানির গ্লাসটিকে অনায়াসে নিজের কাছে নিয়ে আসতে পারি, সেখানে আমি নামাজের মাধ্যমে, ধৈর্য্যের মাধ্যমে, তাঁর কাছে সাহায্য চাচ্ছি, সেই কাজটির সমাধা করার জন্য? এই রূপ ইচ্ছা যদি মনে জাগে, জাগতে পারে। তবে সেই ইচ্ছা তখনই বিলুপ্ত হয়ে যাবে, যখন আমার এ কথা স্মরণে থাকবে যে আল্লাহ্‌র সাথে আমার দেখা হবে। কিভাবে তা বিলুপ্ত হবে? আমার মধ্যে একটি *বিনয়* চ'লে আসবে। যে কাজ আমি আমার দেহ-মনকে ব্যবহার ক'রে করতে পারি, তা না ক'রে রাজার হালে নিজের সিংহাসনে ব'সে আকাশ বাতাস ফেরেশতা কিংবা কোনা কিছুকে আদেশ করা মানেই হলো অহংকার। আর এই অহংকারের ঠিক বিপরীত হলো বিনয়। এ জন্যে আল্লাহ্ বলেছেন যে-তোমরা সাহায্য প্রার্থনা কর, তবে যারা বিনয়ী তারা ছাড়া অন্য কেউ কখনোই সাহায্য প্রার্থনাই করতে পারবে না। তাদের অন্তর থেকে সাহায্য প্রার্থনা উঠেই আসবে না। রাজা সাহায্য প্রার্থনা করতে পারেন না, কারণ তিনি অহংকারী এবং অহংকার তাকেই মানায়, কারণ তিনি সাহায্য দাতা। সাহায্য চাওয়ার প্রক্রিয়া শিখতে হয় প্রজাকে! এবং তা সম্ভব কেবল সঠিক প্রার্থনারই মাধ্যমে।

আবার, আগেই যেমন দেখেছি, সেই গোলক ধাঁধা-প্রার্থনা করা খুবই কঠিন। সেই প্রার্থনাই মানুষের অন্তরের গভীর থেকে, প্রাকৃতিক উৎস থেকে উঠে আসে, যা আসলে তার জীবনকে অর্থময় ক'রে তুলবে, যে প্রার্থনা কবুল হওয়া তার জন্য আসলে মঙ্গলজনক এবং দরকার, যা নিছক ছেলে-খেলা বা তাচ্ছিল্য নয়। আর এ কাজ বিনয়ী যারা তারা ছাড়া আসলেই কেউ করতে পারে না। আমাদের বিপদ ও অসহায় মুহূর্তে আমাদের অন্তর সঠিক বিনয়কে অবলম্বন করে, যা কোরআনে অত্যন্ত বাস্তব উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ্ আমাদেরকে বুঝিয়েছেনঃ

> *তিনি তোমাদেরকে ভ্রমণ করান স্থলভাগে এবং জলভাগে। এমনকি যখন তোমারা নৌকায় আরোহী থাক এবং সেগুলো আরোহীদেরকে নিয়ে অনুকূল বায়ুর সাহায্যে চলতে থাকে, এবং তাতে তারা আনন্দিত হয়, এমতাবস্থায় নৌকাগুলোর ওপর এক প্রচণ্ড বায়ু এসে পড়ে, এবং সবদিক থেকে তরঙ্গমালা সেগুলোকে আঘাত হানে, আর তারা মনে করে যে তারা বিপদে পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছে,* ***তখন তারা আল্লাহকে ডাকে এবং তাদের ধর্মকে তাঁর কাছে উৎসর্গ করে****-যদি তুমি আমাদেরকে এ বিপদ থেকে রক্ষা কর তবে অবশ্যই আমরা কৃতজ্ঞ হয়ে যাব। তার পর যখন তিনি তাদের রক্ষা করেন তখন তারা অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে অত্যাচার করতে থাকে। হে মানুষ! তোমাদের অত্যাচার তোমাদেরই ওপর বর্তাবে। পার্থিব জীবনের ক্ষণিকের সুখ ভোগ ক'রে নাও। তার পর আমারই কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তখন আমি তোমাদের জানিয়ে দেব যা কিছু তোমরা করতে।*

এখানে আমার 'কোরআনের আলোকে ধর্ম কী' নাম বইটি থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করছিঃ "এখানে আল্লাহ্ তাদের কথাই বলছেন যারা পৃথিবীতে জুলুম করার মাধ্যমে মূলত নিজেদের ওপরই জুলুম করে। অর্থাৎ যারা সাধারণ অর্থে অবিশ্বাসী কিন্তু তারা যখন জাহাজে কিংবা নৌকায় চ'ড়ে নদীতে বা সমুদ্রে বিচরণ করতে থাকে, এবং তখন ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ আবহাওয়ার কারণে প্রবল ঢেউ তাদেরকে চার দিক থেকে ঘিরে ধরে, এবং তারা এই আশংকা করে যে হয়তো তাদের ধ্বংস আসন্ন, তখন তারা অন্যান্য সময়ে বিশ্বাস নিয়ে ভাবুক বা না ভাবুক, এবং সত্যকে যতই অবিশ্বাস করুক, **নিজেদেরকে অসহায় অবস্থায় খুঁজে পাওয়ার কারণে নিজেদের অজান্তেই অন্তরের গভীরে স্পষ্টভাবে অনুভব করে যে তাদেরকে এখন বিশেষ এক শক্তির কাছে সাহায্য কামনা করতে হবে**। এবং তারা তা করেও। তাদের এই অসহায় মুহূর্তের আকুতি, এই যে আবেদন, এটির উৎসস্থল অবিকৃত, মৌলিক এবং আদিম। **মনের এই উৎসস্থল থেকে যে আকুতি উঠে আসে, তা-ই প্রার্থনা। জীবনের**

সকল কর্মকাণ্ডে এই উৎসস্থল থেকে শুধু আত্মরক্ষার বাসনা নয়, পবিত্রতা, ভ্রাতৃত্ব, দয়া ইত্যাদি রক্ষার বাসনাও যদি উঠে আসত, তাহলে ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবেই তার আচরণের মধ্যে যে pattern বা শৃঙ্খলা ফুটিয়ে তুলত, তাকেই বলা যেত ধর্ম। ব্যক্তি তার চরম অসহায় মুহূর্তে যে কামনাটি ক'রে থাকে, সেই কামনা যে-চিত্ত থেকে উঠে আসে, সেটিই হলো ধর্মের মনস্তাত্ত্বিক কেন্দ্র। এটিই মূলত ধর্ম-মনের সেই বিন্দুটি যা দেহ সম্পদ, মর্যাদা তথা বাহ্যিকতা ধ্বংস হওয়ার মুহূর্তে জেগে ওঠে। তাই হলো চিত্তের আসল উৎসর্গ। এটিই ধর্ম।" সুতরাং এই ধর্মের মূলই হলো কৃত্রিমতাবর্জিত, স্বাভাবিক বিনয়।

ধৈর্যের বিষয়টিকে আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ধৈর্যহীনতার প্রসঙ্গ টেনেও সহজে অনুধাবন করতে পারি। আমাদের মধ্যে অনেকে পার্থিব উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য ধর্ম-কর্ম করে। ঠিক যেন বক-ধার্মিক। কিন্তু এক পর্যায়ে তারা যখন ভেবে বসে যে তাদের নামাজ-রোজা তাদের জন্য কাঙ্ক্ষিত ফল বয়ে আনছে না, তখন তারা প্রথমত নামায ত্যাগ করে। ধৈর্য্যহীনতার প্রান্তেই রয়েছে...কী বলুন তো?

নামায। আরেকটু প্রসারিত অর্থে, ধৈর্য এবং ঈমান অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। বেঈমান সর্বপ্রথমে যা হারায় তা হলো ধৈর্য।

প্রার্থনা করা খুবই কঠিন। সেই প্রার্থনাই মানুষের অন্তরের গভীর থেকে, প্রাকৃতিক উৎস থেকে উঠে আসে, যা আসলে তার জীবনকে অর্থময় ক'রে তুলবে, যে প্রার্থনা কবুল হওয়া তার জন্যে আসলেই মঙ্গলজনক এবং দরকার, যা নিছক ছেলে-খেলা বা তাচ্ছিল্য নয়। আর এ কাজে বিনয়ী যারা তারা ছাড়া আসলেই কেউ করতে পারে না। আমাদের বিপদ ও অসহায় মুহূর্তে আমাদের অন্তর সঠিক বিনয়কে অবলম্বন করে।

সুরা **বাকারা** আয়াত ২৩৮ থেকে ২৩৯। এখানে আল্লাহ্ বলেছেন:

> *তোমরা নামাজের প্রতি যত্নবান হবে, বিশেষভাবে আসরের নামাযকে সযত্নে রক্ষা করবে এবং আল্লাহ্র সম্মুখে বিনীতিভাবে দাঁড়াবে।*

এখানেও আল্লাহ্ বলেছেন বিনয়ের সাথে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে এবং নামাযে যত্নবান হতে। এইখানে 'বিনয়' শব্দটি আরেকটু বেশি প্রত্যক্ষতা পেয়েছে, কারণ আল্লাহ বলেছেন তাঁর *সামনে* দাঁড়ানোর কথা। যখনই আমরা সরাসরি তাঁর *সামনে* দাঁড়িয়েছি ব'লে মনে করব, তখন যাঁর সামনে দাঁড়িয়েছি তাঁকে দেখি বা না দেখি, এক দিন তাঁর কাছেই যে উপনীত

নামাযে দাঁড়িয়ে যদি বিনীত ভাব মনের মধ্যে উদিত না হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে আমি যাঁর সামনে দাঁড়িয়েছি তাঁর ব্যাপারে সচেতন নই। বিপরীত পক্ষে, আমি যাঁর সামনে দাঁড়িয়েছি তাঁর ব্যাপারে যদি সচেতন থাকি, তাহলে বিনয় অবশ্যই স্বাভাবিকভাবে মনে অনুভূত হবে, যদি অবশ্য আমি যাঁর সামনে দাঁড়িয়েছি তাঁর ব্যাপারে আমার ধারণা ভুল না হয়।

হব, তাঁর কাছেই যে আমাকে ফিরে যেতে হবে, এ কথা যদি স্মরণে রাখি, তাহলেই তাঁকে আমি দেখি বা না দেখি,

বিনয়বোধ এমনিতেই চ'লে আসবে। নামাযে দাঁড়িয়ে যদি বিনীত ভাব মনের মধ্যে উদিত না হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে আমি যাঁর সামনে দাঁড়িয়েছি তাঁর ব্যাপারে সচেতন নই। বিপরীত পক্ষে, আমি যাঁর সামনে দাঁড়িয়েছি তাঁর ব্যাপারে যদি সচেতন থাকি, তাহলে বিনয় অবশ্যই স্বাভাবিকভাবে মনে অনুভূত হবে, যদি অবশ্য আমি যাঁর সামনে দাঁড়িয়েছি তাঁর ব্যাপারে আমার ধারণা ভুল না হয়। এ জন্যে আল্লাহ্ বলেছেন-তোমরা নামাযের প্রতি *যত্নবান* হবে।

পাঠক! একটু উপমার আশ্রয় নিলে বিষয়টির গুরুত্ব অত্যন্ত সুন্দরভাবে অনুধাবন করতে পারা যাবে। কোনো রাজা-বাদশাহ যখন দরবারে আসেন, আগের যুগে যেমনটি ঘটত, তখন আগে থেকেই এক ঘোষক সবাইকে বলতেন-হুঁশিয়ার সাবধান! রাজা বা অমুক সুলতান আসছেন। অর্থাৎ সবাইকে সাবধান হতে বলতেন। এই সাবধানতার মানে কী? *সচেতনতা।* কী ব্যাপারে সচেতনতা? কিছু বিশেষ কাজ যেন ক'রে না ফেলি, আমি কার সামনে এখন রয়েছি বা কার সঙ্গে আমার দেখা হতে যাচ্ছে, এই সব ব্যাপারে সচেতনতা। আর এইরূপ সচেতনতার ফলশ্রুতি হিসেবেই অন্তরে চেতনার যে সক্রিয়তা উপলব্ধি হয়, তার নাম *সাবধানতা*। অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে, আগ্রহের সঙ্গে, সাবধানতার সঙ্গে, নামায আদায় করবে, এবং সে যত্নের একটি অংশ হবে *বিনয়*। সুরা **নিসা** আয়াত ৪৩ এ আল্লাহ বলেছেন:

> *হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নেশার অবস্থায় নামাজের নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা কী বলছ তা বুঝতে পার। এবং অপবিত্র অবস্থাতেও নয়, যদি তোমরা পথচারী না হও, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা স্নান কর।*

এই আয়াতে আল্লাহ আরো কিছু কথা বলেছেন, যেগুলি নামাযের ক্ষেত্রে অবশ্যই পালনীয় বাহ্যিক বিধান। এখানে আল্লাহ

> নামায হলো একটি *যোগাযোগ*। নামায হলো একটি *ঐকান্তিক সচেতনতা।*

একটি কথা বলেছেন, নেশাসক্ত অবস্থায় নামাযের নিকটবর্তী হওয়া যাবে না। কারণ কী?

কারণ, নেশাগ্রস্ত হলে consciousness বা চেতনা বাহ্যিকভাবে কাজ করে না। চেতনা একাগ্র হয় না। তখন চেতনা চ'লে যায় অনুভূতির এলোপাতাড়ি গতিবিধির হাতে। যার ফলে সেই মুহূর্তে concentration বা মনোযোগ প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয় না।

এ থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে নামায হলো একটি *যোগাযোগ।* নামায হলো একটি *ঐকান্তিক সচেতনতা।* এবং আগের আয়াত দু'টিতে আমরা দেখেছি যে এই সচেতনতার কিছু রূপ হয় বিনয় না হয় সতর্কতা ইত্যাদি। সুরা **নিসা** আয়াত ১০৩। এখানে আল্লাহ বলেছেন:

> *তারপর যখন তোমরা নামায শেষ করবে তখন দাঁড়িয়ে ব'সে এবং শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করবে।*

যখন নামায **শেষ** হবে তখন আল্লাহকে স্মরণ করা শুরু করতে হবে। তাহলে কি নামাজের সময়ে আল্লাহকে স্মরণ করা হয়নি? নিশ্চয়ই হয়েছে। কিন্তু নামায শেষ করলে যেন আল্লাহর স্মরণ শেষ হয়ে না যায়, এই জন্য আল্লাহ আমাদেরকে স্পষ্টভাবে *দাঁড়ানো, বসা, এবং শোয়া* অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত ক'রেই এই আদেশ দিচ্ছেন। নামায শেষ হলে আমরা কী করতে পারি? হয় দাঁড়িয়ে থাকব, না হয় কোনো কাজ করব, না হয় ব'সে থাকব, না হয় শুয়ে থাকব, বিশ্রাম নেব। কিন্তু

এই যাবতীয় কর্মকাণ্ড হোক, আর বিশ্রাম হোক, কোনো অবস্থাতেই অন্তর যেন আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে দূরে স'রে না যায়, তিনি সেই তাগিদ দিচ্ছেন।

এখানে বিষয়টিকে একটি উপমা দ্বারা উপস্থাপন করার চেষ্টা করা যেতে পারে। আপনার বাড়ির পাশে একটি বড় নদী আছে। নদী থেকে একটি খাল আপনার বাড়ির কাছাকাছি গেছে। সেই খাল থেকে আপনি ছোট্ট একটি নালা কেটে আপনার জমির দিকে তা প্রবাহিত ক'রে আনলেন। হয়তো বা আপনার কৃষি কাজের জন্য পানির দরকার এবং আপনি এই পানি প্রবাহটিকে ব্যাখ্যা করার জন্য ঠিক এভাবে একটি বাক্য নির্মাণ করলেন-'পানি সমুদ্র থেকে নদীতে এবং তা থেকে খালে এবং তা থেকে আমার সৃষ্ট নালা বেয়ে আমার জমিতে এসেছে'। অর্থাৎ আপনি যে প্রসঙ্গে কথা বললেন তা হলো 'পানি'। কিন্তু আপনি একই সাথে এই পানির প্রবাহের স্তরভেদকে উল্লেখ ক'রে তারই মধ্যে যে ধারাবাহিকতা রয়েছে তাকে তুলে ধরলেন। তা না হলে এই পানি নিয়ে অন্য কিছু বললে হয়তো বা সে কথাটি পূর্ণাঙ্গ হতো না ব'লে আপনি ধারণা করেছেন।

নামায শেষ করলে যেন আল্লাহ্‌র স্মরণ শেষ হয়ে না যায়।

ঠিক সেভাবে আল্লাহ্ এখানে বলেছেন নামাযের কথা, এবং তিনি নামায দিয়ে শুরু করেছেন, অথচ সেখান থেকে শুরু হয়ে তার স্মরণ অর্থাৎ সেই নামায।

যে *শোয়া বসা দাঁড়ানো* অবস্থা পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রবাহিত হবে এবং হওয়া উচিৎ, তাও আমাদেরকে ব'লে দিচ্ছেন।

অর্থাৎ নামায শুধু একটি ওঠা-বসার নাম নয়। তাই যদি হতো, তাহলে আল্লাহ ওঠা-বসা হিসেবেও নামাযকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করতেন না। তিনি বলতেন যে, শুধু ওঠা-বসা মানেই নামায। আর ওঠা-বসা মানেই যেহেতু নামায, সেহেতু শুধু 'নামায' শব্দটি উল্লেখ করলেই ওঠা-বসাকে আলাদা ক'রে উল্লেখ করার দরকার হতো না, কিংবা *ওঠাকে* এবং *বসাকেও* আলাদা ক'রে উল্লেখ করার প্রয়োজন হতো না। অথচ তিনি তাই করেছেন। সুরা **আল-এ-ইমরান** আয়াত ৪৩ এ আল্লাহ বলেছেন:

হে মরিয়ম! তোমার প্রতিপালকের অনুগত হও, সিজদা কর, এবং যারা রুকু করে তাদের সাথে রুকু কর।

আল্লাহ এখানে স্পষ্টভাবে *সিজদা* এবং *রুকুকে* আলাদাভাবে চিহ্নিত করেছেন, যেন প্রতিতিটির আলাদা মূল্য রয়েছে, দেহ-মনের প্রতি আলাদা আধ্যাত্মিক অবদান রয়েছে। ঠিক রুকু এবং সিজদার ব্যাপারে আরো অনেক জায়গায় আল্লাহ এ সব কথা বলেছেন। যেমন সূরা **হাজ্জ** আয়াত ৭৭। এখানে আল্লাহ বলেছেন:

আমরা যখন রুকুতে যাই, তখন আমাদের স্মরণ রাখা উচিৎ যে আমরা রুকুতে এসেছি। আমরা যখন সিজদা করি, তখন আমাদের আলাদভাবে স্মরণ রাখা উচিৎ যে আমরা সিজদা করছি। কারণ এই আচরণগুলির ভিন্ন ভিন্ন মর্যাদা এবং ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্য রয়েছে।

হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা রুকু কর সিজদা কর এবং তোমাদের প্রতিপালকের উপাসনা কর ও সৎ কাজ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

আল্লাহ আমাদেরকে রুকু করতে বলেছেন, সিজদা করতে বলেছেন, এবং আবারও *উপাসনা* করতে বলেছেন। তারপর বলেছেন সৎ *কাজ করতে*। এত কিছু না ব'লে শুধু বলতে পারতেন-তোমরা নামায পড় এবং সৎ কাজ কর। অবশ্য তাও তিনি অন্য জায়গায় বলেছেন। তো, এখানে এত ভেঙ্গে-ভেঙ্গে বলার কী দরকার ছিল?

আসলে আমরা নামায বুঝাতে যদি শুধু ওঠা-বসার শারিরীক ক্রিয়াকাণ্ডকে চিহ্নিত করি, তাহলে ঐ ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে আমি নিজেও যখন সক্রিয় তখন তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা অংশ বিশেষের প্রতি হয়তো আমার খুব বেশি নজর থাকবে না। হয়তো আমার নজর থাকবে এই বিষয়ের প্রতি যে, আমি কখন নামাজ শেষ করব? এবং আমি কয় রাকাত নামায পড়লাম? আমি গুনতে শুরু করব এবং আমার দৃষ্টিভঙ্গি হয়ে যাবে গণনধর্মী। কিন্তু আল্লাহ্ এখানে পূর্ণাঙ্গ নামাজকে দূর থেকে গণনা ক'রে তার ভেতর থেকেও তাকে গণনা করেছেন-তাকে রুকু সিজদা ইত্যাদি আকারে ভাগ করেছেন। অর্থাৎ আমরা যখন রুকুতে

নিশ্চয়ই 'রুকু' এবং 'সিজদা' আর 'উপাসনা' এক নয়। রুকু এবং সিজদার সঙ্গে দেহের আধ্যাত্মিকতা জড়িত, শ্রম জড়িত, ওঠা-বসার নির্দিষ্ট সংখ্যক গণনা এবং হিসাব-নিকাশ জড়িত। আর উপাসনা? তা হলো পুরোপুরি আত্মিক ব্যাপার। দেহকে রুকু সিজদার কাঠামোয় প্রশিক্ষণ না দিয়ে যে মনটিকে অন্তরে লালন করা হয়, তা নিশ্চয়ই উপাসনার উপযুক্ত হবে না। এ কারণে আল্লাহ্ প্রথমে রুকু সিজদার কথা বলেছেন এবং তার পরে উপাসনার কথা বলেছেন, এবং এই উপাসনা করার পর মনে যে বিশুদ্ধতা তৈরি হবে, যে সদিচ্ছা তৈরি হবে, দেহের যে নমনীয়তা তৈরি হবে, তা স্বাভাবিকভাবেই ভালো কাজের প্রবণতা প্রদর্শন করবে।

যাই, তখন আমাদের স্মরণ রাখা উচিৎ যে আমরা সিজদা করছি। কারণ এই আচরণগুলির ভিন্ন ভিন্ন মর্যাদা এবং ভিন্ন ভিন্ন

নামায শুধু একটি ওঠা-বসার নাম নয়। তাই যদি হতো, তাহলে আল্লাহ ওঠা-বসা হিসেবেও নামাযকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করতেন না। তিনি বলতেন যে, শুধু ওঠা-বসা মানেই নামায। আর ওঠা-বসা মানেই যেহেতু নামায, সেহেতু শুধু 'নামায' শব্দটি উল্লেখ করলেই ওঠা-বসাকে আলাদা ক'রে উল্লেখ করার দরকার হতো না, কিংবা *ওঠাকে* এবং *বসাকেও* আলাদা ক'রে উল্লেখ করার প্রয়োজন হতো না।

দেহকে রুকু সিজদার কাঠামোয় প্রশিক্ষণ না দিয়ে যে মনটিকে অন্তরে লালন করা হয়, তা নিশ্চয়ই উপাসনার উপযুক্ত হবে না।

তাৎপর্য রয়েছে।

তারপর আল্লাহ বলেছেন-তোমাদের প্রতিপালকের উপাসনা কর। তাহলে নিশ্চয়ই 'রুকু' এবং 'সিজদা' আর 'উপাসনা' এক নয়। রুকু এবং সিজদা সঙ্গে দেহের আধ্যাত্মিকতা জড়িত, শ্রম জড়িত, ওঠা-বসার নির্দিষ্ট সংখ্যক গণনা এবং হিসাব-নিকাশ জড়িত। আর উপাসনা? তা হলো পুরোপুরি আত্মিক ব্যাপার। দেহকে রুকু সিজদার কাঠামোয় প্রশিক্ষণ না দিয়ে যে মনটিকে অন্তরে লালন করা হয়, তা নিশ্চয়ই উপাসনার উপযুক্ত হবে না। এ কারণে আল্লাহ প্রথমে রুকু সিজদার কথা বলেছেন এবং তারপরে উপাসনার কথা বলেছেন, এবং এই উপাসনা করার পর মনে যে বিশুদ্ধতা তৈরি হবে, যে সদিচ্ছ তৈরি হবে, দেহের যে নমনীয়তা তৈরি হবে, তা স্বাভাবিকভাবেই ভালো কাজের প্রবণতা প্রদর্শণ করবে। আর তাই অবশেষে আল্লাহ বলেছেন- ও সৎ কাজ কর। আল্লাহ আগে সৎকাজ করতে বলতে পারতেন, কিন্তু যে দেহ ও মন রুকু সিজদা এবং উপাসনা করেনি তার কাছে সৎ কাজের কামনা করা নিশ্চয়ই বেশি যৌক্তিক নয়। তাছাড়া অসৎ কাজ থেকে নিজেকে দূরে রাখার পন্থা অবলম্বন না ক'রে শুধু সৎ কাজ করলেও লাভ হবে না, কারণ সৎ কাজ অসৎ কাজ দ্বারা বিলুপ্ত হবে। তাই আল্লাহ্ প্রথমে অসৎ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার উপায় ব'লে দিয়ে আমাদেরকে সৎ কাজ করতে বলেছেন।

সূরা **নিসা** আয়াত ১৪২ থেকে ১৪৩

মোনাফেকগণ আল্লাহকে প্রতারিত করতে চায়। বস্তুত তিনিই তাদেরকে প্রতারিত ক'রে থাকেন এবং যখন তারা নামাযে দাঁড়ায় তখন ঢিলেঢালাভাবে কেবল লোক দেখানোর জন্য দাঁড়ায় এবং আল্লাহকে তারা অল্পই স্মরণ করে। দোটানায় দোদুল্যমান-না এদিকে না ওদিকে, এবং আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তুমি তার জন্য কখনও কোনো পথ পাবে না।

নামায কী তা আমরা জানি না। যারা অবিশ্বাসী তারা তো নামায দেখে একেবারে তাচ্ছিল্যই করে। আবার যারা বিশ্বাসী অথচ নামাযের ভিতরের কিছুই জানে না, তারা অন্তত নিজের অজান্তে এইটুকু করে যে, জীবনে প্রচুর নামায পড়লে ব'লে বেড়ায় যে তারা অনেক নামায পড়েছে কিংবা অপরকে দেখানোর জন্য নামায পড়ে কিংবা সে নামায পড়ার সময়ে আশেপাশে লোকজন থাকলেও তার লক্ষ নিজের অজান্তে অপরের দিকেই চ'লে যায়। এই দিয়েই কি এটা প্রমাণিত হয় না যে, নামায আসলেই একটি অত্যন্ত মহামূল্যবান জিনিস, সেই মূল্যটির রহস্য আমরা জানি বা না জানি? যার কারণে, যখনই তা আমি আদায় করছি, তখন আমার মূল্য কেউ লক্ষ করছে কি না সে ব্যাপারেও আমার খেয়াল চ'লে যাচ্ছে?

এই আয়াতটি মোনাফেকদের প্রসঙ্গে প্রকাশ করা হচ্ছে। আমরা নিজেদেরকে ঈমানদার ব'লে মনে করি। অবশ্যই নিজেদেরকে মোনাফেক মনে করার কোনো সংগত কারণ নেই। তবে মোনাফেকদের প্রসঙ্গে যা বলা হচ্ছে সেই আয়াত

আমার জন্যও প্রযোজ্য কি না, সে চিন্তা করা আমাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু আমরা সেই ভাবে চিন্তা করি না ব'লেই আয়াতগুলি আমাদের কাছ থেকে দূরে থাকে। আমরা ভেবে বসি যে, যাদের প্রসঙ্গে আয়াতগুলি প্রযোজ্য তারা অন্য কেউ, তারা আমাদের কাছেও ঘৃণ্য এবং আল্লাহ্‌র কাছেও ঘৃণ্য। ফলে আয়াতগুলি আমাদের কাছে পরোক্ষ হয়ে যায়। কিন্তু আসল কথা হলো, ততক্ষণ আমরা কোরআন বুঝতে পারব না যতক্ষণ তার আয়াত আমাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষতা সহকারে কথা না বলবে। এই আয়াত আমার বেলায় প্রযোজ্য কিনা তা যদি আমি চিন্তা করি, তাহলেই আমি এর কিছু মর্ম বুঝতে পারব। লোক দেখানোর জন্য নামায পড়ে এমন অনেক লোককে আমরা নিশ্চয়ই দেখেছি। বেশ, তাদের কথা বাদ দিলাম। আমরাই যখন নামায পড়ি, তখনও তো অনেক লোককে তা আমাদের দেখাতে ইচ্ছা করে। এমন পরিস্থিতি কি আসে না? এমন অনুভূতি কি আমাদের মধ্যে জাগে না? কিংবা আমি নামায পড়লাম এবং অনেক পরে কোনো না কোনো ভাবে মানুষকে তা বলতে ইচ্ছা করল। এমন ইচ্ছা হয় না কি?

কথা হলো, নামায কী তা আমরা জানি না। যারা অবিশ্বাসী তারা তো নামায দেখে একেবারে তাচ্ছিল্যই করে। আবার যারা বিশ্বাসী অথচ নামাযের ভিতরের কিছুই জানে না, তারা অন্তত নিজের অজান্তে এইটুকু করে যে, জীবনে প্রচুর নামায পড়লে ব'লে বেড়ায় যে তারা অনেক নামায পড়েছে কিংবা অপরকে দেখানোর জন্যে নামায পড়ে কিংবা সে নামায পড়ার সময়ে আশেপাশে লোকজন থাকলেও তার লক্ষ নিজের অজান্তে অপরের দিকেই চ'লে যায়। এই দিয়েই কি এটা প্রমাণিত হয় না যে, নামায আসলেই একটি অত্যন্ত মহামূল্যবান জিনিস, সেই মূল্যটির রহস্য আমরা জানি বা না জানি? যার কারণে, যখনই তা আমি আদায় করছি, তখন আমার মূল্য কেউ লক্ষ করছে কি না সে ব্যাপারেও আমার খেয়াল চ'লে যাচ্ছে? সামান্য একটু ওঠা-বসা, দু'একটি মুখস্থ বাক্য উচ্চারণ করা, আর কিছু নয়-তা সত্ত্বেও আমি আশা করছি যে গাদা-গাদা লোক দেখুক আমি তা করছি। নিশ্চয়ই আমাদের এই মানসিকতা প্রমাণ করে যে নামায মানুষের সৃষ্ট কোনো আধ্যাত্মিক অবকাঠামো নয়। বরং তার মধ্যে এমন কিছু লুকিয়ে রয়েছে যা আসলেই আমাদেরকে নিজেদেরকে মূল্যবান ভাবতে প্রবৃত্ত করে এবং সেই মূল্য আমরা যদি সরাসরি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আদায় করতে না পারি বা পারব না ব'লে বিশ্বাস রাখি, বা ততখানি আত্মবিশ্বাস যদি আমাদের মধ্যে না থাকে, তাহলে সেই মূল্য অপরের কাছ থেকে আদায় করার সাধ মনের গভীরে জেগে উঠবে।

এখানে আরেকটি ব্যাপার- নামাযের মধ্যে বিশুদ্ধভাবে মনটাকে একনিবিষ্ট করা যে কত কঠিন তা যারা জীবনে দুই এক রাকাত নামায পড়েছেন তারাও জানেন। তার মধ্যে মন বিক্ষিপ্তভাবে দৌড়-ঝাঁপ শুরু ক'রে দেয়। ঠিক তাই আল্লাহ বলেছেন- দোটানায় মন দোদুল্যমান- ন এদিক না ওদিক। 'দিক' শব্দটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। অন্তরের যদি *দিক* ঠিক না হয়, তাহলে তা এদিকেও ছোটে ওদিকে ছোটে, অথচ কোনো দিকেই স্থির হতে পারে না। এই প্রসঙ্গ থেকে নামায কী সে ব্যাপারে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিতও পাওয়া যাচ্ছে। আল্লাহ মোনাফেকদের নামাযের সমালোচনা করেছেন। কী ব'লে? যে, তারা শিথিলতার সঙ্গে, অসাবধান হয়ে নামাযে দাঁড়ায়। অর্থাৎ তারা নামাযে *যত্নবান* হয় না, *সাবধান* হয় না। আল্লাহ যে তাদের সামনে আছেন, কিংবা তারা যে আল্লাহ্‌র সামনে আছে, একথা স্মরণ করে না। ফলে তারা যে লোকজনের সামনে আছে, এ কথাই তাদের মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে, এবং আল্লাহকে তারা অত্যন্ত অল্প স্মরণ করে- মনটা দোটানায় দোদুল্যমান থাকে, এদিকে ওদিকে ছোটাছুটি করে।

এই যদি হয় মোনোফেকের নামায, তাহলে বিশ্বাসীর নামায নিশ্চয়ই এর উল্টো। আর এই অবস্থাগুলির উল্টো কোনো অবস্থা যদি মনে কখনও প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে তার নাম *মনোযোগ*, বিশুদ্ধ চিত্ত, কন্‌সেন্‌ট্রেশন, ধ্যান, মোরাকাবা-হয়তো বা আয়না! নামায হলো এক প্রকারের মনোযোগ এবং অন্তরের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সাথে যোগাযোগেরই একটি ক্রিয়াকাণ্ড। সূরা **আরাফ** আয়াত ২৯:

বল, আমার প্রতিপালক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। প্রত্যেক নামাযে তোমাদের লক্ষ্য স্থির রাখবে এবং তাঁরই আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁকে ডাকবে। তিনি যেভাবে প্রথমে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, তোমরা সেভাবে ফিরে আসবে।

এ কথাটি আল্লাহ তাঁর অবস্থান থেকে বলছেন। যার কারণে তিনি বলেননি যে তোমরা সেভাবে ফিরে 'যাবে'- বরং তিনি বলছেন যে তোমরা সেভাবে ফিরে 'আসবে'। অর্থাৎ তিনি তাঁর স্তর থেকে নামাযীকে লক্ষ্য ক'রে কথা বলছেন-লক্ষ স্থির রাখবে। একটু আগে মোনাফেকদের নামাযের ব্যাপারে আমরা যা বলেছি, তার ঠিক বিপরীত। লক্ষ্যের স্থিরতা দৃষ্টি এবং মন এবং কান এবং অনুভূতি সবগুলি ইন্দ্রিয়ের সমন্বয়ের ব্যাপার। আর এই সমন্বয় কখনোই সংঘটিত হবে না, যদি না রুকু সিজদার একবারে শুরুতেই বিশুদ্ধ চিত্তে আল্লাহকে লক্ষ্য করা হয়।

আল্লাহকে লক্ষ্য করা মানে কী? অনেকে ভাবতে পারে যে নামাযের মধ্যে intellectual তত্ত্ব রোমন্থনের বা যৌক্তিক চিন্তনের উপায়ে নিজের সঙ্গে বা আল্লাহর সঙ্গে কথা বলা। কিন্তু না, এভাবে নামাযের মধ্যে লক্ষ্য স্থির করা যায় না। নামায এমন কোনো আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান নয় যার মধ্যে আমরা চিন্তা করি। বরং নামাযের মধ্যে নামায এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে চিন্তা করারও দরকার নেই। করা যাবেও না। নামাযের মধ্যে যখন আদৌ কোনো চিন্তা এসে হাজির হবে তখনই মনে এমন অবস্থা সৃষ্টি হবে যার নাম শৈথিল্য, লোক-দেখানো নামায পড়া, অল্প স্মরণ করা, দোটানায় দোদুল্যমানতা ইত্যাদি। অর্থাৎ মোনাফেকের প্রসঙ্গে আল্লাহ্ যা যা বলেছেন, তাই। যদি আমরা নামাযে লক্ষ স্থির রাখতে পারি, এবং যদি

> আল্লাহ্ যেখানে বলছেন *প্রত্যেক* নামাযের সময়ে সুন্দর পোশাক পরিধান করতে, সেখানে আমরা *শুক্রবারেই* তা ক'রে থাকি, অন্য সময়ে তা করি না।

বিশুদ্ধ চিত্তটিকে তাঁর সামনে তুলে ধরতে পারি, তাহলে আমাদের নবজন্ম হবে। তাই আল্লাহ্ বলেছেন, *প্রথমে তোমাদের যেভাবে তিনি সৃষ্টি করেছেন তোমরা সেভাবে ফিরে আসবে।* ঐ নামাজের মধ্যেই, ঐ চিত্তের উৎসর্গের হাত ধ'রেই আমরা তার কাছে এমনভাবে ফিরে যেতে পারি যেন আমাদের নবজন্ম হলো। সূরা **আরাফ** আয়াত **৩১:**

হে আদমের বংশধরগণ! প্রত্যেক নামাযের সময়ে সুন্দর পোশাক পরিধান করবে। পানাহার করবে। কিন্তু অপচয় করবে না। তিনি অপব্যয়কারীকে পছন্দ করেন না। আল্লাহ্ বলতে পারতেন-'সেভাবে তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে' বা 'আমি তোমাদেরকে সেভাবে ফিরিয়ে আনব'। তা না ব'লে তিনি বলছেন, 'সেভাবে তোমরা ফিরে আসবে'। অর্থাৎ নামাযী তার লক্ষ্যের স্থিরতা দ্বারা সঠিক নামাজের মধ্য দিয়ে সক্রিয়ভাবেই তাঁর দিকে ফিরে যাবে।

সুতরাং এই ফিরে যাওয়া তথা নবজন্মের প্রসঙ্গটি নামাযেরই প্রসঙ্গে।

আমাদের দেশে শুক্রবারে নামায পড়ার হিড়িক প'ড়ে যায় এবং শুক্রবারে যে প্রচুর মানুষ নামায পড়ে তা একেবারে চোখেই দেখা যায়। আমরা পথে-ঘাটে, প্রতি অলিতে গলিতে মসজিদের আশে-পাশে প্রচুর পরিচ্ছন্ন সুন্দর টুপি এবং পাঞ্জাবী লক্ষ করি। অনেক ক্ষেত্রে ব্যাপারটি এমন হয়েছে যেন শুক্রবারে নামায পড়া একটি ফ্যাশানে পরিণত হয়েছে। অনেককে দেখা যায় ত্রিশ লাখ টাকা দামের গাড়িতে চ'ড়ে পাঁচ মাইল দশ মাইল দূরের মসজিদে শখ ক'রে নামায পড়তে যান এবং সেখান থেকে আবার ফিরে আসেন। এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়টি হলো এই যে, শুক্রবারে দুপুর দুইটার আগ পর্যন্ত গোটা বাংলাদেশ এবং বিশেষত প্রধান শহরগুলিতে বেশ সুন্দর সুন্দর দামী পোশাক এবং পাঞ্জাবী দেখা যায়। আল্লাহ্ যেখানে

বলছেন *প্রত্যেক* নামাযের সময়ে সুন্দর পোশাক পরিধান করতে, সেখানে আমরা শুধু *শুক্রবারেই* তা ক'রে থাকি, অন্য সময়ে তা করি না।

প্রিয় পাঠক! হয়তো এখন আপনার নজরে একটি বিশেষ বিষয় ধরা পড়েছে। সুতরাং এই নিয়ে নিজেই একটু চিন্তা করুন। আল্লাহ্ চাইলে অনেক কিছু বুঝতে পারবেন। আল্লাহ্ বলছেন-পানাহার করবে কিন্তু অপচয় করবে না। তিনি অপব্যয়কারীকে পছন্দ করনে না। তিনি সুন্দর পোশাক পরিধান করতে বলছেন, আর এই উছিলায় তাঁর কাছ থেকে অনুমতিপত্র পেয়ে আমরা অত্যন্ত পয়সা খরচা ক'রে, অত্যন্ত মেধা ও সময় দিয়ে, সুন্দর সুন্দর পোশাক বানাতে অভ্যস্ত। যার করণে তিনি পাশেই ব'লে রাখছেন যে-অপব্যয় করবে না। অর্থাৎ সুন্দর পোশাক পরবে, কিন্তু সবচেয়ে যে সুন্দর পোশাকটি, তা নামাযের জন্য রেখে দিবে, অন্যান্য ক্ষেত্রে যে পোশাকগুলি পরবে, তা তার চেয়ে যেন সুন্দর না হয়। কারণ সুন্দর জিনিসটি শুধু আল্লাহ্‌র জন্য। আর নিছক নামযের সময়ে পরতে হবে ব'লে গাদাগাদা সুন্দর পোশাক তৈরি ক'রে তোমরা অপব্যয় কর না, যা প্রয়োজন নয়। কারণ সত্যিকারের পোষাক হলো তাকওয়া বা আল্লাহ্‌ভীতি। ঠিক এই কথাটি আল্লাহ অন্য এক আয়াতে বলেছেন।

> *হে আদম সন্তানগণ! আমি তোমাদের জন্য পোশাক সৃষ্টি করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থানকে আবৃত করে এবং বেশ-ভূষার উপকরণও হয়; এবং আল্লাহ্-ভীতির পোশাক, এটিই শ্রেষ্ঠ। এটা আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের মধ্যে অন্যতম যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।*

(সূরা **আ'রাফ** , আয়াত -২৬)

সুতরাং আল্লাহ যখন প্রত্যেক নামাযে সুন্দর পোশাক পরিচ্ছেদের কথা বলেন, তখন একেবারেই যে বাইরের পোশাকের কথা বলেন, তাও নয়। তাহলে তিনি *প্রত্যেক* নামাযে সুন্দর পোশাকের কথা বলতেন না এবং তিনি এ কথার সাথে এও ব'লে রাখতেন যে-তোমাদের মধ্যে যারা গরীব তারা সাধ্যমতো যেভাবে পার সেইভাবে পরিধান কর। যেমন অর্থনৈতিক যোগ্যতার বিষয় এলে গরীবদের প্রসঙ্গে তিনি স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়ে ব'লে থাকেন: তোমরা ব্যয় কর তোমাদের *সাধ্যানুযায়ী।* যার সাধ্য যতটুকু, ক্ষমতা যতটুকু ইত্যাদি অনুযায়ী। সাধ্য অনুযায়ী খোরপোষও দেন-মোহর দেয়া (যেমন সূরা বাকারা, ২৩১), দান করা, বেশি বেশি ইবাদত করার কথা তিনি বলেছেন। এমনকি তিনি সরাসরি এও বলেছেন যে তিনি কারোর ওপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত ভার চাপান না। অর্থাৎ যেখানে সম্পদের কথা আসে তিনি সেখানে গরীবদেরকে আলাদা ক'রে লক্ষ্য রেখে তাদের সাধ্যের কথা স্মরণ ক'রে কথা বলেন। কিন্তু এখানে তিনি বলছেন সুন্দর পোশাক পরতে। এখানে তিনি যদি শুধু বাহ্যিক সৌন্দর্যের কথাই বলতেন, তাহলে কথাটি দ্বারা গরিবদের ওপর অবিচার করা হতো। তাই তো তার একটু পরেই আবার বলছেন-অপব্যয় কর না। তার মানে, পোশাক মানে যে শুধুই পোশাক-মখমল ভেলভেট দামী কাপড়-তা মনে ক'র না। তোমার যে মিথ্যা আবরণ, প্রতারণার আচরণ, চারিদিকের এই আবরণ খুলে ফেলে বিনয় লজ্জা ভয় সতর্কতা সাবধানতা এই সব সৌন্দর্যের পোশাক, রূপের পোশাক প'রে আমার সামনে দাঁড়াও। সূরা **আরাফ** আয়াত ৪৫ এবং ৪৬। এখানে আল্লাহ্ বলছেন:

> *তোমরা বিনীতভাবে খুব গোপনে তোমাদের প্রতিপালককে ডাক। তিনি সীমালংঘনকারীকে পছন্দ করেন না। পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের পর তাতে বিপর্যয় ঘটাবে না। তাঁকে ভয় ও আশার সঙ্গে ডাকবে। নিশ্চয়ই আল্লাহর অনুগ্রহ সৎ কর্মপরায়ণদের নিকটবর্তী।*

এই বাক্যগুলি দেখে মনে হচ্ছে যেন এগুলি কয়েক শত বাক্যের সারাংশ। এত সংক্ষেপে এত বৈচিত্রময় তথ্য আল্লাহ্ এখানে উপস্থাপন করেছেন যে চিন্তাশীল মস্তিষ্ক এই আয়াতগুলির ওপর দিয়ে চলতে গিয়ে হিমশিম খায়। আল্লাহ্ বলছেন- তোমরা বিনীতভাবে এবং গোপনে তোমাদের প্রতিপালককে ডাক। *বিনয়* কাকে বলে তা নিজে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। আর বিনয়ের আরো একটি পূর্বশর্ত হলো-বিনয় মূলত গোপনীয়তার পরিবেশেই সবচেয়ে বেশি অনুভূত হয় এবং

> যখন কেউ দেখছে না, শুধু আল্লাহ দেখছেন, তখন আমি 'আল্লাহ যে আমাকে দেখছেন' এই বিষয়টিকে নিয়ে কী ভাবছি? এই বিষয়টির প্রতি কী আচরণ করছি? এই বিষয়টিকে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করছি? তাই নির্ধারণ করবে আমার বিনয় কেমন।

মাধুর্যমণ্ডিত হয়। কেন তাঁকে *গোপনে* ডাকতে বলা হচ্ছে? আমরা যখন নামায পড়ি, এবং সেই নামায আর দশ জনে পর্যবেক্ষণ করছে কি না সে ব্যাপারেও আমাদের মধ্যে সচেতনতা কাজ করে, তখন কিন্তু আমাদের মধ্যে বিনয় জাগে না, বরং আল্লাহ্র সামনে আমরা উদ্ধত থাকি, আর বিনয় জাগে অন্য মানুষের সামনে। কারণ তাদেরকে আমি আমার ধার্মিকতা দেখাতে চাই। বিনয়ী *সাজতে চাই।* আর এই জন্য প্রকৃত বিনয় স্পষ্ট হয় *গোপনে*। যখন কেউ দেখছে না, শুধু আল্লাহ্ দেখছেন, তখন আমি 'আল্লাহ্ যে আমাকে দেখছেন' এই বিষয়টিকে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করছি? তাই নির্ধারণ করবে আমার বিনয় কেমন। এবং আল্লাহ্ পদ্ধতি শিখিয়ে দিচ্ছেন-ভয় ও আশার সঙ্গে ডাকবে। ভয়ে ভয়ে থাকতে হবে- নিজ কৃতকর্মের কথা স্মরণ ক'রে- আমি যে-অপরাধে অপরাধী, সে অপরাধের শাস্তি যদি আমাকে দেয়াই হয়, তাহলে কী ভয়ংকর পরিণতিই না আমার হবে! সে কথা স্মরণ ক'রে আমি ভয় পাব। আবার আশান্বিত হব এই কারণে যে, আমি যাঁর কাছ থেকে ক্ষমা পেতে পারি, এখন সরাসরি তাঁর মুখোমুখি হয়েছি, এবং তিনি পরম দয়াময়। ভয় আর আশার মিশ্রণ হলো এই যে, আমার মধ্যে বিশ্বাস রয়েছে, কিন্তু নিশ্চয়তা নেই; আমার মধ্যে আস্থা রয়েছে, কিন্তু ঔদ্ধত্য নেই। অর্থাৎ আমি জানি না আল্লাহ আমাকে নিয়ে কী করবেন। জ্ঞানের নিশ্চয়তা মানুষকে উদ্ধত বানিয়ে দেয়। ভয় এবং আশার দ্বিমুখী কম্পন দেহ-মনকে বিগলিত করে, নম্র করে এবং এক পর্যায়ে মনকে প্রশস্ত করে। যে কারণে আল্লাহ্ বলছেন:

নামায যথাযথভাবে পড়বে দিনের দু'প্রান্ত ভাগে ও রাতের প্রথমাংশে। সৎকর্ম অবশ্যই অসৎকর্মকে দূর ক'রে দেয়। যারা উপদেশ গ্রহণ করে, এটা তাদের জন্য উপদেশ।

(সূরা **হুদ** আয়াত ১১৪)

আল্লাহ বলেছেন সৎ কর্ম বা ভালো কাজ খারাপ কাজকে দূর করে। ভালো কাজ কোনটি? এখানে নামাজ নিজেই ভালো কাজ। তা খারাপ কাজকে দূর করবে কী ক'রে? খারাপ কাজ থেকে মনকে দূরে রাখবে। খারাপ কাজ করতেই দিবে না। খারাপ কাজের প্রতি মনে বিতৃষ্ণার সৃষ্টি করবে। বরং তা অন্তরকে খারাপ কাজের মারেফত দান করবে।

খারাপের রহস্য জানার ফলে অন্তর আর খারাপ দ্বারা প্রভাবিত হবে না। তার প্রতি আকৃষ্টও হবে না। তাই আল্লাহ বলছেন- যারা উপদেশ গ্রহণ করে, এ হলো তাদের জন্য উপদেশ। যারা *তথ্য গ্রহণ করে* তাদের কথা বলা হচ্ছে না। তথ্য গ্রহণ ক'রে তা লিপিবদ্ধ ক'রে রাখা যায়-কাগজে কম্পিউটারে স্মৃতিশক্তিতে। কিন্তু উপদেশ গ্রহণ ক'রে তা *আচরণের মধ্যেই সক্রিয় রাখতে হয়* এবং সেই অনুসারে কাজ করতে হয়। তাই আল্লাহ বলছেন-যারা উপদেশ গ্রহণ করে এ বাণী তাদের জন্য। যদি কেউ উপদেশ গ্রহণ না করে, দেহ-মনের সক্রিয়তায় আদেশগুলিকে নিজের আদলে পালন না করে, তাহলে এ কথায় তার কোনো কাজ হবে না। কারণ সে চিন্তা করবে সৎ, অথচ কাজটি ঠিকই খারাপ ক'রে ফেলবে। তার চিন্তা এবং বিশ্বাস এবং ভালোবাসা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তখন আর সৎ কর্ম অসৎ কর্মকে দূরে ঠেলে দেবে না। কারণ তখন শুধু চিন্তা করাকেই সৎ কর্ম ব'লে মনে হবে।

দেহ-মনের শক্তিপুঞ্জকে সক্রিয়ভাবে প্রয়োগ করাকে সৎকর্ম ব'লে মনে হবে না। বরং আলস্য এসে মনকে আছন্ন করবে। সূরা **রা'দ** আয়াত ২২-এ আল্লাহ বলছেন:

> *এবং যারা তাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য কষ্ট বরণ করে, যথাযথভাবে নামায পড়ে, আমি তাদের যে জীবনোপকরণ দিয়েছি তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, এবং যারা ভালো দ্বারা মন্দকে দূর করে, এদেরই জন্য শুভ পরিণাম।*

অর্থাৎ এই জাতীয় লোকদের প্রধান লক্ষ থাকে তাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভ করা। আমরা অনেক সময়ে ভেবে বসি যে

তথ্য গ্রহণ ক'রে তা লিপিবদ্ধ ক'রে রাখা যায়-কাগজে কম্পিউটারের স্মৃতিশক্তিতে। কিন্তু উপদেশ গ্রহণ ক'রে তা *আচরণের মধ্যেই সক্রিয় রাখতে হয়* এবং সেই অনুসারে কাজ করতে হয়। তাই আল্লাহ বলছেন- যারা উপদেশ গ্রহণ করে এ বাণী তাদের জন্য। যদি কেউ উপদেশ গ্রহণ না করে, দেহ-মনের সক্রিয়তায় আদেশগুলিকে নিজের আদলে পালন না করে, তাহলে এ কথায় তার কোনো কাজ হবে না। কারণ সে চিন্তা করবে সৎ, অথচ কাজটি ঠিকই খারাপ করে ফেলবে। তার চিন্তা এবং বিশ্বাস এবং ভালোবাসা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তখন আর সৎ কর্ম অসৎ কর্মকে দূরে ঠেলে দেবে না। কারণ তখন শুধু চিন্তা করাকেই সৎ কর্ম ব'লে মনে হবে। দেহ-মনের শক্তিপুঞ্জকে সক্রিয়ভাবে প্রয়োগ করাকে সৎকর্ম ব'লে মনে হবে না। বরং আলস্য এসে মনকে আছন্ন করবে।

প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভ করা মানেই হলো তাঁকে তুষ্ট করা-তোয়াজ করা, কোনো না কোনো ভাবে তাঁকে খুশি করা, এবং এভাবে নিজে আনন্দ পাওয়া বা আত্মপ্রসাদ লাভ করা। কিন্তু এই কথাটি আংশিক সত্য। তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করার পূর্বশর্ত হলো, তিনি আমাকে যে-অবস্থায় রেখেছেন সেই অবস্থায় *নিজেই সন্তুষ্ট থাকা।* আর আমি যদি নিজেই সন্তুষ্ট থাকতে পারি, তখনই আশা করতে পারি যে তিনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন। কারণ তখন তো তিনি এমনিতেই সন্তুষ্ট রয়েছেন। তিনি

আমার জন্য যা করেছেন আমি তা মেনে নিয়েছি। আর তখনই আমি যথাযথভাবে নামায পড়তে পারব যখন আমার মন তাঁর প্রতি এভাবে আত্মসমর্পণ করবে। অন্য পরিস্থিতিতে নয়।

মন যখন অস্থির হয়ে ভবিষ্যতের দিকে ধাবিত হতে থাকে, তার কামনা-বাসনা পূরনের জন্যে, কিংবা অতীতের দিকে ধাবিত হতে থাকে, তার আক্রোশকে স্মরণ ক'রে, অপূর্ণ বাসনাকে স্মরণ ক'রে, তখন সে সন্তুষ্ট বোধ করে না। আর যে-মন আল্লাহ্‌র আচরণের ব্যাপারে নিজেই সন্তুষ্ট নয়, সে-মন সীমালংঘন করে, বা বেয়াদবি করে, আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার করে। সুতরাং সে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে পারে না।

নামায যেহেতু দেহ-মনকে সার্বিক ভারসাম্যের স্তর থেকে নতুনভাবে সুসজ্জিত করে এবং ভারসাম্যপূর্ণ করে, সেহেতু অস্থির মনে তা প্রতিষ্ঠিতই হবে না। আল্লাহ বলছেন যে, আমি তোমাদেরকে যে উপকরণ দিয়েছি-টাকা পয়সা সম্পদ-তা থেকে গোপনে এবং প্রকাশ্যে ব্যয় কর। প্রকাশ্যে ব্যয় করতে হবে এই জন্য যে আমার ব্যয় দেখে আর দশ জনও ভালো কাজে উদ্বুদ্ধ হবে। এবং গোপনে ব্যয় করতে হবে এই জন্য যে আমার সব ভালো কাজ মানুষ দেখুক এই কামনা যেন আমার মধ্যে স্থির না হয়ে যায়। কারণ একটু আগেই আমরা জেনেছি, প্রকৃত ভদ্রতা হয় *গোপন*। তখন আল্লাহ বলছেন-যারা ভালো দ্বারা মন্দকে দূর করে-ভালো দ্বারা মন্দকে দূর করা চাট্টিখানি কথা নয়। সেজন্য চাই ধৈর্য, আস্থা, ক্ষমা, দয়া, মহানুভবতা, ভয় এবং আশা-সবই।

সূরা **ইব্রাহিম** আয়াত ৪০ এবং ৪১:

নামায যেহেতু দেহ-মনকে সার্বিক ভারসাম্যের স্তর থেকে নতুনভাবে সুসজ্জিত করে এবং ভারসাম্যপূর্ণ করে, সেহেতু অস্থির মনে তা প্রতিষ্ঠিত হবে না।

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এবং আমার বংশধরদের কিছুকে যথাযথ নামায প্রতিষ্ঠাকারী কর। হে আমাদের প্রতিপালক! আমার প্রর্থনা গ্রহণ কর।

ইব্রাহিম (আ.) আল্লাহর কাছে প্রর্থনা করেছেন-প্রথমে নিজের তরফ থেকে- হে 'আমার' প্রতিপালক! তারপর তার বংশধরদের তরফ থেকে -হে 'আমাদের' প্রতিপালক! কি সুন্দর প্রার্থনা! এবং কত স্পষ্ট অথচ লুকায়িত ইঙ্গিত! তিনি নামাযের ব্যাপারে প্রার্থনা করছেন এভাবে যে 'আমার' বংশধরদের মধ্য থেকে কিছুকে নামায প্রতিষ্ঠাকারী কর। তিনি জানেন যে সবাই নামায প্রতিষ্ঠাকারী হবে না এবং আল্লাহর পরিকল্পনায় তা নেই। সুতরাং তিনি স্পষ্ট ক'রে বলছেন-

শুধু যে নিজে নামায পড়লেই হবে না,. পরিবার পরিজনকে নামাযের নির্দেশ দিতে হবে।

নামায শুধুমাত্র ব্যক্তিগত বেহেস্তের জন্য নয়। নামায বংশ-পরম্পরায় ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকা অর্থাৎ অনুষ্ঠিত হতে থাকা একটি তাওহীদমুখী বা আল্লাহর একত্বমুখী মানসিক প্রক্রিয়া। আদমের সন্তানের আদমী মনের অবশ্যম্ভাবী কামনা। ফলে তা একটি দায়িত্বও বটে। শুধু *নিজের* পুরষ্কার নয়।

'কিছুকে' নামায প্রতিষ্ঠাকারী কর। তার পর বলছেন-আমার প্রর্থনা গ্রহণ কর। তার মানে তার প্রর্থনা গৃহীত হয়ে গেল। তিনি বলেছেন- হে 'আমাদের' প্রতিপালক-এবং পরেই বলেছেন-'আমার' প্রার্থনা কবুল কর। অর্থাৎ তিনি তাঁর সমস্ত সন্তানের- সমস্ত অনুসারীর-পক্ষ থেকে দোয়া করেছেন। তাহলে কেন তা কবুল হবে না? অবশ্যই হবে।

এখানে ইব্রাহিম (আ.) তার বংশধরদের নামায সম্পর্কে একটি সুকামনা করছেন। বংশধরদের নামায পড়ার আদেশ করতে হবে-কোরআনে আল্লহ সেই তাগিদও দিয়েছেন। কিন্তু *আমার বংশধরেরা যেন নামায পড়ে এ কামনা করাও আমার ধার্মিকতার অংশ।* এ থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে নামায শুধুমাত্র ব্যক্তিগত বেহেস্তের জন্য নয়। নামায বংশ-পরম্পরা ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকা অর্থাৎ অনুষ্ঠিত হতে থাকা একটি তাওহীদমুখী বা আল্লাহর একত্বমুখী মানসিক প্রক্রিয়া। আদম সন্তানের আদমী মনের অবশ্যম্ভাবী কামনা। ফলে তা একটি দায়িত্বও বটে। শুধু *নিজের* পুরষ্কার নয়। এবং ব্যক্তির ক্ষেত্রে যখন তা প্রযোজ্য, তখন তা ব্যক্তির মৃত্যু পর্যন্ত যেন ধারাবাহিকভাবে তারই সঙ্গে থাকে, সে তাগাদাও দেয়া হয়েছে।

সূরা **হিজর** আয়াত ৯৮ ও ৯৯:

> *সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা দ্বারা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং তুমি সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও। তোমার মৃত্যু উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার প্রতিপালকের উপাসনা কর।*

কেউ কেউ ব'লে থাকে-সাধনার একটি বিশেষ স্তর পর্যন্ত নামায দরকার। তর পরে আর নামাযের প্রয়োজন নেই। তাই আল্লাহ সেই কথাটির বৈধতাকে নস্যাৎ ক'রে দিয়ে বলছেন যে, মৃত্যু পর্যন্তই আল্লাহর উপাসনা ক'রে যেতে হবে এবং তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার মাধ্যমে অন্তরকে তাঁর কাছে নিবেদন করতে থাকতে হবে।

এখন, কথা হলো, প্রতিপালকের প্রশংসা কিভাবে করতে হবে? কিভাবে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করতে হবে? কিভাবে তাঁর মহিমা ঘোষণা করতে হবে? আল্লাহর প্রশংসা কিভাবে করতে হয় এবং তার স্বরূপ কী তা নিয়ে আমরা অন্য একটি নিবন্ধে আলোচনা করেছি। তাই এখানে তা নিয়ে আলোচনা করা হলো না। আল্লাহর পবিত্রতার ব্যাপারটি খুব বেশি সাদামাটা বা সহজ নয়। মনের মধ্যে এভাবে ভেবে দেখতে হবে-আমরা কি আদৌ পবিত্র? আমাদের চিন্তা, আমাদের কাজ, আমাদের উদ্দেশ্য? আমরা যতই পবিত্র হবার চেষ্টা করি না কেন, আমরা হয়তো পবিত্র হওয়ার দিকে এগিয়ে যেতে থাকি, কিন্তু পবিত্রতা অর্জন যে কত কঠিন তাও বুঝতে পারি। আর এই জন্যই আল্লাহ যে চির পবিত্র, এমনকি তাঁর সম্বন্ধে আমার ভুল

ধারণা, আমার চিন্তা, আমার আচরণের ভুল, তাঁর পবিত্রতাকে যে কলুষিত করতে পারে না, এই প্রতীতী অন্তরে উদিত হওয়া না পর্যন্ত আমার অপবিত্রতার ব্যাপারে আমি নিশ্চিত হতে পারি না, এবং আমার অপবিত্রতাকে তাঁর কাছে নিবেদন ক'রে আমি পবিত্রতা অর্জন করতে পারি না। আর যেহেতু তাঁকে কোনোভাবে অপবিত্র করা সম্ভব নয়, যেহেতু এমন কোনো কিছুই তিনি করতে পারেন না বা করেন না যার জন্য তিনি প্রসংশিত নন, সেহেতু তিনি মহামহিমাময়। আর এভাবে তাঁর মাহাত্বের ধারাবাহিকতার স্বীকৃতির একটি চরম মানসিক পরিণতি হলো, তাঁর মহিমা প্রকাশ্যে ঘোষণা করা। আর এ কাজ তখন একটি চূড়ান্ত পরিণতির দিকে এগোবে যখন আমরা তাঁর পবিত্রতা মহিমা এবং প্রসংশার ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা রেখে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হব।

আজীবন যে নামায পড়তে হবে, তা থেকে যে রেহাই নেই, তা ঈসা (আ.) নিজেও ঘোষণা করেছিলেন। সূরা **মরিয়ম** আয়াত **৩১:**

> *যেখানেই আমি থাকি না কেন, তিনি আমাকে আশীসভাজন করেছেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যত দিন জীবিত থাকি, তত দিন নামায ও জাকাত আদায় করতে, ও আমার মায়ের প্রতি অনুগত থাকতে।*

সূরা **মরিয়ম** আয়াত ৫৫। এখানে আল্লাহ বলছেন:

> *সে তার পরিজনবর্গকে নামাজ ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিত এবং সে ছিল তার প্রতিপালকের সন্তোষজনক।*

এখানে শুধু যে নিজে নামায পড়লেই হবে না, পরিবার পরিজনকে নামাযের নির্দেশ দিতে হবে, সে কথা আল্লাহ স্পষ্ট ক'রে বলেছেন। এর আগে আমরা দেখেছিলাম যে পরিবার-পরিজনকে নামাযের নির্দেশ দেওয়া ছাড়াও তাদের মধ্যেও কেউ কেউ নামায প্রতিষ্ঠাকারী হোক-এই *কামনা* করাও ধার্মিকতার অংশ। এখন দেখছি সক্রিয়ভাবে *আদেশের* মাধ্যমে নামায প্রতিষ্ঠা করার প্রতি একটি তাগিদ। সুতরাং এই বিচারে নামাযের আরেকটি পরিচয় পাওয়া গেল। নামায হলো এমন একটি আধ্যাত্মিক অর্জন, এমন একটি মহামূল্যবান সম্পদ, যা বংশ পরম্পরায় অন্যেরা যাতে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করতে পারে, সে ব্যাপারে বিশ্বাসী ব্যক্তির পরিকল্পনা থাকা উচিৎ। আর যেহেতু নামায এমন একটি মূল্যবান সম্পদ-ঠিক যেন একটি জাদুর আংটি-সেহেতু তাকে অক্ষতভাবে, অবিক্রিতভাবে পরবর্তী প্রজন্মের হাতে তুলে দিতে পারাও মানব হিসাবে জীবনের সার্থকতার একটি অংশ।

সূরা **মরিয়ম** আয়াত ৫৯:

নামায হলো এমন একটি আধ্যাত্মিক অর্জন, এমন একটি মহামূল্যবান সম্পদ, যা বংশ পরম্পরা অন্যেরা যাতে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করতে পারে, সে ব্যাপারে বিশ্বাসী ব্যক্তির পরিকল্পনা থাকা উচিৎ। আর যেহেতু নামায এমন একটি মূল্যবান সম্পদ- ঠিক যেন একটি জাদুর আংটি-সেহেতু তাকে অক্ষতভাবে, অবিক্রিতভাবে পরবর্তী প্রজন্মের হাতে তুলে দিতে পারাও মানব হিসাবে জীবনের সার্থকতার একটি অংশ।

তার পরে এমন অপদার্থ পরবর্তীগণ এল যারা নামায নষ্ট করল ও লালসার দ্বারা বশীভূত হলো। সুতরাং ওরা অচিরেই কুকর্মের শাস্তি ভোগ করবে।

তারা কিন্তু অন্তরের লালসা কামনা বাসনার হাতে বন্দী হয়ে গেল। আর তখনই তা ঘটল যখন তারা নামাযকে নষ্ট করল। যখন নামাযকে শুধু একটি ব্যাখ্যার পর্যায়ে নিয়ে এটুকু বলল যে, নামায হলো অন্তরে আল্লাহর সংগে যোগাযোগ, সুতরাং বাইরে নামাযের অবকাঠামোটিকে হুবহু অনুসরণ না করলেও চলে, তখন বাহ্যিক আচরণপূর্ণ নামাজের অভাব বা অবর্তমানতা তাদের অন্তরকে বিপথে চালিত করল। কিন্তু বাইরের অবকাঠামো যে মনের বিক্ষিপ্ত গতিবিধিকে সংযত করে, সংহত করে, সে ধারণা তাদের ছিল না।

নামায হলো এমন একটি ভারসাম্য স্থাপনকারী কাজ যা মনের অসংখ্য-অগণিত বিক্ষিপ্ত দিকের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। আবার মানবের দেহ-মনের ভারসাম্য দ্বারা গোটা মহাবিশ্ব প্রভাবিত হয়-যেহেতু আল্লাহ সবকিছুকে *কার্য-কারণ সূত্রে* মানবের অধীন ক'রে দিয়েছেন-সেহেতু আমরা এ কথা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে নামায দ্বারা গোটা মহাবিশ্ব প্রভাবিত ও উপকৃত হয়।

এই আয়াত থেকে আমরা যে তথ্য পাচ্ছি তা থেকে এক ধাপ উপরে গিয়ে অনুমান করা যায় যে, নামায হলো এমন একটি ভারসাম্য স্থাপনকারী কাজ যা মনের অসংখ্য-অগণিত বিক্ষিপ্ত দিকের মধ্যে *সমন্বয় সাধন করে।* -আবার মানবের দেহ-মনের ভারসাম্য দ্বারা গোটা মহাবিশ্ব প্রভাবিত হয়-যেহেতু আল্লাহ সবকিছুকে *কার্য-কারণ সূত্রে* মানবের অধীন ক'রে দিয়েছেন-সেহেতু আমরা এ কথা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে নামায দ্বারা গোটা মহাবিশ্ব প্রভাবিত ও উপকৃত হয়। কথিত আছে যে হযরত খিজির (আ.) যেখানে নামায পড়েন, তার চারদিক সঙ্গে সঙ্গে সবুজ বনানীতে ছেয়ে যায়। যাহোক, এ সবকিছুর মূল হলো সঠিক চিত্তদান।

অর্থাৎ এই অভ্যন্তরীন ও বাহ্যিক সমন্বয় সাধনের কেন্দ্রে রয়েছে concentration বা মনোযোগ, যা সংগঠিত হয় স্মরণের মাধ্যমে। সূরা **ত্বা-হা** আয়াত ১৪। এখানে আল্লাহ্ বলছেন:

আমি আল্লাহ। আমি ভিন্ন (অন্য) কোনো উপাস্য নেই। অতএব আমার উপাসনা কর এবং আমাকে স্মরণ করার জন্য যথাযথভাবে নামায পড়।

এখানে আল্লাহ্ একেবারে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে নামাযের উদ্দেশ্য হলো তাঁকে *স্মরণ* করা। আমার স্মরণ তোমার দেহ-মনে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যেই তোমাকে নামায পড়তে হবে। আর এই আয়াতের অর্থের প্রত্যক্ষতা এত প্রবল যে, এর অর্থকে অত্যন্ত সহজেই বিকৃত ক'রে কেউ কেউ ব'লে ফেলে যে আল্লাহকে যদি নামায ছাড়াও স্মরণ করা যায়, তাহলে নামাযের প্রয়োজন নেই। কিন্তু বিষয়টি যে তা নয় তা অন্যান্য আয়াত থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি। সূরা **ত্বা-হা** আয়াত ১৩২। এখানে আল্লাহ বলেছেন:

এবং তোমার পরিবারবর্গকে নামাযের আদেশ দাও এবং তাতে অবিচলিত থাক। আমি তোমার নিকট কোনো জীবনোপকরণ চাই না; আমি তোমাকে জীবনোপকরণ দেই; এবং সাবধানীদের জন্য তো শুভ পরিণাম।

এই আয়াতটিও অত্যন্ত বহুমাত্রিক এবং এটিকে একটু চিন্তার সাথে বিবেচনা করলে দেখা যায় যে জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তথ্য এসে এখানে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরে জড়ো হয়েছে। আল্লাহ্ বলেছেন পরিবার বর্গকে নামাজের আদেশ দিতে এবং অনবরত এই আদেশ দিতে থাকতে এবং নিজে এতে অবিচলিত থাকতে। অর্থাৎ নিজে নামায পড়ব, তাদেরকে নামায পড়তে বলব, এবং এই বলায় অবিচলিত থাকব।

এবং সবাই মিলে নামাযেও অবিচলিত থাকব। কোনোক্রমেই তা ত্যাগ করব না। আর এ কাজ করতে গিয়ে আমরা অনেকে ভেবে বসি যে, নামায পড়তে তো দেখা যাচ্ছে অনেক সময় নষ্ট হচ্ছে। প্রচুর সময় নষ্ট হচ্ছে। মাথাপিছু প্রতি দিনে যদি পাঁচ ঘন্টা ক'রে সময় নষ্ট হয় বা দুই তিন ঘন্টা ক'রে সময় নষ্ট হয়, তাহলে যে-পরিবারে চার জন লোক রয়েছে সেই পরিবারে দিনে পনের বিশ ঘন্টা সময় নষ্ট হচ্ছে। আর এভাবে কোনো অবিশ্বাসী চিন্তাবিদ যদি তুখোর অর্থনীতিবিদ হয়ে থাকেন, তিনি হয়তো গোট জাতি নামায পড়তে গিয়ে কত সময় নষ্ট করল এবং তার আর্থিক মূল্য কত তাও হিসেব ক'রে বের করবেন, এবং এক পর্যায়ে হয়তো তিনি ভবিষ্যদ্বাণী ক'রে ছাড়বেন যে এত বছর পর এ দেশে আকাল হবে, মানুষ না খেয়ে মরবে, কর্মচঞ্চলতা কম হবে, উৎপাদন কম হবে, ইত্যাদি। তাই আল্লাহ্ বলছেন-আমি তোমার নিকট কোনো জীবনোপকরণ চাই না। এমনটি নয় যে নামায-রোজা বাদ দিয়ে সারাদিন কাজ করতে হবে এবং কাজের মাধ্যমে রোজগার

আমরা অনেকে ভেবে বসি যে, নামায পড়তে তো দেখা যাচ্ছে অনেক সময় নষ্ট হচ্ছে। প্রচুর সময় নষ্ট হচ্ছে। মাথাপিছু প্রতি দিনে যদি পাঁচ ঘন্টা ক'রে সময় নষ্ট হয় বা দুই তিন ঘন্টা ক'রে সময় নষ্ট হয়, তাহলে যে-পরিবারে চার জন লোক রয়েছে সেই পরিবারে দিনে পনর বিশ ঘন্টা সময় নষ্ট হচ্ছে। আর এভাবে কোনো অবিশ্বাসী চিন্তাবিদ যদি তুখোড় অর্থনীতিবিদ হয়ে থাকেন, তিনি হয়তো গোটা জাতি নামায পড়তে গিয়ে কত সময় নষ্ট করল এবং তার আর্থিক মূল্য কত তাও হিসেব ক'রে বের করবেন, এবং এক পর্যায়ে হয়তো তিনি ভবিষ্যদ্বাণী ক'রে ছাড়বেন যে এত বছর পর এ দেশে আকাল হবে, মানুষ না খেয়ে মরবে, কর্মচঞ্চলতা কম হবে, উৎপাদন কম হবে, ইত্যাদি।

ক'রে তিনি আমাকে খাওয়াবেন। তা নয়। বরং আল্লাহ বলছেন-আমিই তোমাকে জীবনোপকরণ দিই। অর্থাৎ তুমি যদি আমার সাথে যোগযোগ রাখ, সেই যোগাযোগের ফলশ্রুতি হিসেবেই জীবনোপকরণ আসবে। তার পরে বলছেন-সাবধানীদের জন্যই তো শুভ পরিণাম। অর্থাৎ তোমরা যদি সাবধান থাক, অন্তরের সাবধানতা অবলম্বন কর, তাহলে এই সাবধানী মন নিয়ে প্রয়োজনীয় যে-কাজটুকু করবে, তাই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। তবে এই কথার এই অর্থ নয় যে, সারারাত দিন শুধু নামায পড়ব, কাজকাম কিছু করব না। এই ব্যাপারেও তো আল্লাহ্ সাবধান হতে বলছেন। সুতরাং সাবধানতা শব্দটিকে উভয় পক্ষেই প্রয়োগ করতে হবে। আর একটি বিষয়ঃ এই আয়াত থেকে এও বুঝা যাচ্ছে যে সঠিক নামায বস্তুজগৎকে এমনভাবে সমৃদ্ধ করে যে তার একটি প্রতিদান হিসেবে আমরা জীবনোপকরণ পাই। এটি হলো নামাযের একটি মহাজাগতিক ফলশ্রুতি। শুষ্ক মাটির বৃষ্টি যেমন জীবন, তেমনি নামায হলো মন, দেহ, প্রকৃতির বস্তুরাজির জন্য জীবনস্বরূপ। সূরা **হজ্জ**। আয়াত ৭৭। এখানে আল্লাহ বলেছেনঃ

> *হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা রুকু কর সিজদা কর এবং তোমাদের প্রতিপালকের উপাসনা কর ও সৎ কাজ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।*

এখানে আল্লাহ আলাদাভাবে রুকু করতে বলছেন এবং সিজদা করতে বলছেন, যা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে রুকু সিজদার আলাদা গুরুত্ব রয়েছে, যে ব্যাপারে আমরা ইতোমধ্যেই আলোকপাত করেছি, এবং আল্লাহ বলছেন তাঁর উপাসনা করতে। নিশ্চয়ই উপাসনা প্রথামিকভাবে একটি মানসিক ব্যাপার। এবং তার পর বলছেন ভালো কাজ করতে। অর্থাৎ কাজ করতে বলছেন-উপার্জন রোজগার করতে বলছেন-এবং কাজের মাধ্যমে ভালো উদ্দেশ্যকে সফল করতে হলে যত রকমের কাজ করতে হয়, সবই করতে বলছেন। তার মধ্যে রক্তদান কর্মসূচী পড়তে পারে, অপরকে সাহায্য করাও পড়তে পারে, ঘুমানোও পড়তে পারে, কারণ ঘুমানোও একটি ভাল কাজ, যেহেতু দেহের জন্য তা দরকার। সুতরাং আল্লাহ কাজকে দূরে রাখেননি।

আমরা অনেক সময়ে ব'লে থাকি যে জগতের কাজও করব, আল্লাহর কাজও করব। কিন্তু এই কথাটিই ভুল। এই ভুলকে ভুল ব'লে চিহ্নিত করতে না পেরে আমরা মানুষকে ধর্মের দিকে ডাক দেয়ার সময়ে ব'লে থাকি-আসুন, কিছু আখেরাতের কাজও করি। আসলে আখেরাতের কাজ ব'লে আলাদা কিছু নেই। সবই আখেরাতের কাজ। সবকিছুর হিসাব-নিকাশের মাধ্যমেই সেখানে আমাদের অবস্থান নির্ধারিত হবে। যেটুকু ভোগ করা আল্লাহর আদেশ, তাঁর আদেশ অনুসারে সেটুকু ভোগ করাও ইবাদত। সূরা **হাজ্জ** আয়াত ৭৮। এখানে আল্লাহ বলছেন:

আমরা অনেক সময়ে ব'লে থাকি যে জগতের কাজও করব, আল্লাহর কাজও করব। কিন্তু এই কথাটিই ভুল। এই ভুলকে ভুল ব'লে চিহ্নিত করতে না পেরে আমরা মানুষকে ধর্মের দিকে ডাক দেয়ার সময়ে ব'লে থাকি-আসুন, কিছু আখেরাতের কাজও করি। আসলে আখেরাতের কাজ ব'লে আলাদা কিছু নেই। সবই আখেরাতের কাজ। সবকিছুর হিসাব-নিকাশের মাধ্যমেই সেখানে আমাদের অবস্থান নির্ধারিত হবে।

> *সুতরাং তোমরা যথাযথভাবে নামায পড় যাকাত দাও এবং আল্লাহকে অবলম্বন কর। তিনি তোমাদের অভিভাবক। কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী তিনি!*

এখানে নামায পড়তে গিয়ে আমাদের যে সময় নষ্ট হয় ব'লে আমরা কখনো কখনো মনে ক'রে থাকি, কিংবা অনেকে ব'লে থাকে, সেই কথা অত্যন্ত পর্দার আড়ালে লুকিয়ে রাখা শব্দের ম্যামে আরেক বার খণ্ডন করা হয়েছে। আল্লাহ বলছেন-যথাযথভাবে নামায পড়। নামাযকে যথাযথ করতে হলে যতটুকু সময় ও শ্রম দিতে হয় ততটুকু সময় ও শ্রম দাও এবং যাকাত দাও। যাকাত অর্থ কী? আমরা জানি তার বাহ্যিক অর্থ। এর যত আধ্যাত্মিক অর্থ রয়েছে তা এখানে আলোচ্য নয়। এবং আল্লাহ বলছেন-আল্লাহকে অবলম্বন কর। অর্থাৎ আল্লাহর কোরআনের বিধান মেনে যা কিছু করা প্রয়োজন, সবই কর। তিনি তোমাদের 'অভিভাবক'। অভিভাবক কে? আমরা 'অভিভাবক' শব্দটিকে সচরাচর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ এবং ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার ব্যাপারেই প্রয়োগ ক'রে থাকি। স্কুলের তরফ থেকে শিক্ষার্থীদের পিতা-মাতা তথা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে যারা আছে তাদেরকে অভিভাবক ব'লে গণ্য করা হয়। আমার ব্যাপারে যিনি ভাবছেন, আমার ভালো-মন্দ সম্পর্কে সমস্ত ভাবনা যিনি তাঁর নিজের মাথায় নিয়েছেন, ফলে আমাকে আর ভাবতে হচ্ছে না, তিনি আমার অভিভাবক। আল্লাহ্ বলছেন-তোমরা সাত-পাঁচ ভাব, যার কারণে না পার সুস্থ মনে নামায পড়তে, না পার কাজ করতে। নামায পড়তে গিয়ে কাজের সময় নষ্ট হচ্ছে কি না এই ভেবে নামায কম পড়। আবার নামায কম পড়ার কারণে তোমাদের ভাবনা বেড়ে যায়। যাকাত দিতে গিয়ে অর্থ ক্ষয় হচ্ছে কি না এই নিয়ে ভাবনায় প'ড়ে যাও। আবার যাকাত না দেয়ার

কারণে অর্থাগম ক'মে যায়। সুতরাং অতশত না ভেবে তোমরা তোমাদের ভাবনার দায়িত্বকে আমার ওপর ছেড়ে দাও। তোমাদের মাথা দিয়ে বরং শুধু আমাকে নিয়ে ভাব। সঠিক উপায়ে কিভাবে কাজ করতে হয় তা নিয়ে ভাব। অর্থাৎ সততা নিয়ে ভাব-যার অর্থ হলো আমাকে অবলম্বন করা। পরিস্থিতি যতই কঠিন হোক, কিভাবে সৎ থাকা যায়, তা নিয়ে ভাব, এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে আমি ভাবব। আমিই তোমাদের অভিভাবক।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে নামায যথাযথভাবে আদায় করলে তা আমাদেরকে ভাবনাহীন ক'রে দিতে পারে। Anxiety বিহীন, দুশ্চিন্তাবিহীন, জীবন দান করতে পারে। দুশ্চিন্তা হলো মানব শক্তির বা মানসিক energy-র সবচেয়ে বড় ক্ষয়ের কারণ। মানুষের যে শক্তির রয়েছে, তা যতদিন আছে, ততদিন তাকে ব্যবহার ক'রে মানুষের উচিৎ তার আধ্যাত্মিক লক্ষ্য অর্জন করা। অথচ সেই শক্তি আমরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে এখানে-সেখানে প্রয়োগ করি এবং নিজেরাই খাল কেটে নিজেদের ঘরে বা অন্তত পুকুরে কুমির নিয়ে আসি। পরে আমরা সেই পুকুরে গোসল করতে নামি এবং...।

সূরা **মোমেনুন** আয়াত ১-১১। এখানে আল্লাহ বলছেনঃ

> বিশ্বাসীরা অবশ্যই সফলকাম হয়েছে। যারা নিজেদের নামাযে বিনয়ে নম্র, যারা নিরর্থক ক্রিয়াকলাপ থেকে বিরত থাকে, যারা যাকাত দানে সক্রিয়, যারা নিজেদের যৌন অঙ্গসমুহকে সংযত রাখে, তবে নিজেদের পত্নী অথবা অধীকারভুক্ত দাসীগণের ক্ষেত্রে অন্যথা করলে তারা নিন্দনীয় হবে না, এবং কেউ এদের ছাড়া অন্য কাউকে কামনা করলে তারা সীমালংঘণকারী হবে, এবং যারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে, এবং যারা নিজেদের *নামাযে যত্নবান*- তারাই হবে অধিকারী। অধিকারী হবে ফেরদাউসের। যাতে ওরা চিরস্থায়ী হবে।

এখানে একটি জিনিস লক্ষ করুন। আল্লাহ পাক প্রথমে বলছেন-যারা নিজেদের *নামাযে বিনয়ী নম্র।* তার পর অনেকগুলি কথা বলছেন এবং আবার কিছু দূর গিয়ে বলছেন-যারা নিজেদের *নামাযে যত্নবান*। নামাযের প্রসঙ্গকে দুই প্রান্তে রেখে মাঝামাঝি তিনি এক গুচ্ছ লক্ষণকে অন্তর্ভূক্ত করেছেন। সেই গুলি কী কী? অসার ক্রিয়াকলাপ অর্থাৎ অর্থহীন কথাবার্তা গালগপ্প-বাদামভাজা খেতে খেতে যে ধরণের গল্প করা হয়- এসব থেকে বিরত থাকা, যারা যাকাত দেয়-অর্থাৎ তাদের সম্পদে যে আর দশজনেরও ভাগ আছে, তা স্বীকার করে এবং সে দায়িত্ব পালনও করে, যারা যৌনতার ব্যাপারে পবিত্রতা রক্ষা করে এবং আমানত রক্ষা করে এবং প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে। এসব কথা ব'লে তিনি আবার বলছেন-যারা নিজেদের নামাযে যত্নবান। দুই প্রান্তে তিনি *নামাযকে* রেখেছেন; মাঝামাঝি একটি *বিশ্বাসীর সঠিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে* উল্লেখ করেছেন। এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে এই বৈশিষ্টগুলিকে অন্তরে লালন করা এবং আচরণে প্রকাশ করা তখনই সম্ভব যখন হৃদয়বৃত্তির শুরুতেই থাকে নামায এবং জীবনের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডের মধ্যেও চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে থাকে নামায।

মানুষের যাবতীয় ভালো বৈশিষ্ট্যগুলি নামাযের মধ্যেই প্রতিশ্রুতিশীল, বাইরে নয়। অর্থাৎ নামায আমাদের যাবতীয় ভালো বৈশিষ্ট্যকে ধারণ ক'রে আছে এবং খারাপ বৈশিষ্ট্যকে বিতাড়িত ক'রে দূরে রেখেছে। এই জন্যে অন্য এক আয়াতে আল্লাহ বলছেন-নিশ্চয়ই নামায খারাপ কাজ থেকে মানুষকে দূরে রাখে।

সূরা **শুয়ারা** আয়াত ২১৭-২২০। এখানে আল্লাহ বলছেনঃ

তুমি নির্ভর কর পরাক্রমশালী পরম দয়ালু আল্লাহর ওপর, যিনি তোমাকে দেখেন যখন তুমি দণ্ডায়মান হও নামাযে এবং তোমাকে দেখেন সিজদাকারীদের সাথে উঠতে বসতে। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

আল্লাহ রাসুল (স.)-কে বলছেন যে-আমি তোমাকে দেখি যখন তুমি নামাযে দাঁড়াও। এই কথাটি যদি আমরা স্মরণে রাখি যে আমি যখন নামাযে দাঁড়িয়েছি তখন তিনি আমাকে দেখছেন, তাহলে আমার চোখ তাঁকে দেখুক না দেখুক, আমার তরফ থেকে তাঁকে দেখতে আর কিছু বাকি থাকে না। আমি তাঁকে দেখব এই কামনা বাসনা অনেক ক্ষেত্রে নিছক স্বপ্ন ব'লে, পাগলের প্রমাদ ব'লে মনে হতে পারে। কিন্তু তিনি যে আমাকে দেখছেন, এটা তো চিরকাল সত্য। আর তিনি যে আমাকে দেখছেন, এই চেতনা যখন আমার মধ্যে উদিত হয়, তখন এই চেতনাকে যদি আমরা বুঝি, তাহলে অবশ্যই অন্তরে নামায তার সুফল এনে দেবে। তখন অন্তর তার

এই কথাটি যদি আমরা স্মরণে রাখি যে আমি যখন নামাযে দাঁড়িয়েছি তখন তিনি আমাকে দেখছেন, তাহলে আমার চোখ তাঁকে দেখুক না দেখুক, আমার তরফ থেকে তাঁকে দেখতে আর কিছু বাকি থাকি না। আমি তাঁকে দেখব এই কামনা বাসনা অনেক ক্ষেত্রে নিছক স্বপ্ন ব'লে, পাগলের প্রমাদ ব'লে মনে হতে পারে। কিন্তু তিনি যে আমাকে দেখছেন, এটা তে চিরকাল সত্য। আর তিনি যে আমাকে দেখছেন, এই চেতনা যখন আমার মধ্যে উদিত হয়, তখন এই চেতনা যদি আমরা বুঝি, তাহলে অবশ্যই অন্তরে নামায তার সুফল এনে দেবে। তখন অন্তর তার সমস্ত কালিমা এবং অন্ধকার থেকে উঠে এসে নবজীবন লাভ করবে।

সমস্ত কালিমা এবং অন্ধকার থেকে উঠে এসে নবজীবন লাভ করবে।

এক ভ্রান্ত মারেফতপন্থী একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করল-হাসীসে এসেছে যে এমনভাবে নামাযে দাঁড়াও যে তুমি আল্লাহকে দেখছ; বস্তুত তাঁকে দেখতে না পেলেও তিনি তো তোমাকে দেখছেন। এই হাদীসটি ব'লে তিনি প্রশ্ন করলেন-আপনি কি তাঁকে দেখেন যখন নামাযে দাঁড়ান? আমি বললাম-হাদীসটিতে দু'টি সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে-প্রথমটি আমার দ্বারা সম্ভব হয় না, কারণ আমি অপবিত্র, তবে দ্বিতীয়টি আমার দ্বারা সম্ভব হয়, কারণ আমি বিশ্বাসী। তিনি বললেন-আমি নামাযে তাঁকে দেখতে না পেয়ে নামায ত্যাগ করেছি। আমি বললাম-আমি নামাযে তাঁকে দেখিনি ব'লেই নামাযকে আঁকড়ে ধ'রে আছি। কোরআনের শুরুতেই আল্লাহ বলেছেন-হুদাল্লিল মুত্তাক্বীন...যারা না দেখে আল্লাহকে ভয় করে তাদের জন্য কোরআন পথপ্রদর্শকস্বরূপ হবে। সুতরাং আমি তাঁকে দেখতে না পাওয়ার কারণেই কোরানের কথাগুলিকে সত্য ব'লে মেনে নিতে পেরেছি। আমি তাঁকে দেখতে পাইনি ব'লেই বিশ্বাস করতে পেরেছি যে তিনি সত্য। তাঁকে না দেখতে পেলে তাঁর আনুগত্য করব না-এই ধারণাই অহংকার। সুতরাং আসুন আমরা সাবধান হই, যেন নামায আমাদেরকে ত্যাগ না করে।

সূরা **রুম** আয়াত **১৭-১৯**। এখানে আল্লাহ বলছেন:

সুতরাং তোমরা সন্ধ্যায় ও প্রভাতে আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। এবং অপরাহ্নে ও মধ্যাহ্নে। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে সকল প্রশংসা তাঁরই। তিনি মৃত হতে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটান এবং ভূমির মৃত্যুর পর ওকে পুনরুজ্জীবিত করেন। এভাবেই তোমারা উত্থিত হবে।

আগে একটি আয়াতে যেমন আমরা দেখেছিলাম যে নামাযের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের নবজীবন দান করবেন। এখানেও সেই একই তথ্যের সমর্থন পেলাম। তার পক্ষে প্রমাণ পেলাম। আল্লাহ মৃত থেকে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটান। আমার অন্তর যদি মৃত হয়, অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, তার পরও যদি আমি সঠিক পথে চলি এবং সুন্দরভাবে নামায পড়ি, আল্লাহকে সঠিকভাবে প্রশংসা করতে পারি, এবং তাঁর মহিমা কীর্ত্তন করতে পারি, তাহলে তিনি আমার অন্তরকে আবার জাগিয়ে দেবেন। অন্যভাবে, আমি যদি আমার নফস্ এর মৃত্যু ঘটাতে পারি, তাহলেও সেই মৃত থেকে আল্লাহ জীবন্তকে তুলে আনবেন। যে জন্য তিনি বলছেন- জমিনের মৃত্যুর পর আমি তাকে পুনর্জীবন দান করি। নফসের জমিন শুকিয়ে মরু হয়ে গেলে সেখানে যদি অপবিত্র কামনা-বাসনার কুঁড়ি-কন্দ আর গজাতে না পারে, তাহলে আল্লাহ তাকে পুনরুজ্জীবিত ক'রে নিরাপদভাবে সৃজনশীল ও সম্ভাবনাময় ক'রে গ'ড়ে তোলেন।

সূরা **রুম** আয়াত **৩১**। এখানে আল্লাহ বলছেন:

বিশুদ্ধ চিত্তে তাঁর অভিমুখী হও, তাঁকে ভয় কর। যথাযথভাবে নামায পড় এবং অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

যে ব্যক্তি নামায প'ড়ে ফেলল, তার পর তার পক্ষ থেকে অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই ব'লেই মনে করা যায়। অথচ তার পরও আল্লাহ অংশীবাদীদের সামিল হওয়ার সম্ভাবনার কথা বলেছেন, 'এবং' দিয়ে কথাটির নামাযের সঙ্গে সংযুক্ত ক'রে উচ্চারণ করছেন। তাহলে দেখা গেল যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর জন্যও নামায পড়া যায়। এবং বিশ্বাসীর পক্ষেও অংশীবাদী হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি রয়ে যেতে পারে। তাই আল্লাহ বলেছেন-তুমি নামায শুধু আমার জন্যই পড়, অন্য কিছুর জন্য পড় না। নামায একটি উপায়। নামায একটি মাধ্যম। এই মাধ্যমকে আমি যদি খারাপ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করি, তাহলে যা পাব তা আমার জন্যে সার্বিক বিচারে অবশ্যই মঙ্গলজনক হবে না। আর নামাযের মধ্যেও অংশীবাদীত্ব আসতে পারে। সে কেমন? আমরা জানি নামাযের মধ্যেও ইবলিস ঢুকে পড়ে। যে কারণে নামাযের ভিতর আমাদের একাগ্রতা আসতে চায় না। পুরোনো পচা-গলা সঞ্চিত চিন্তা মাথার সামনে এসে ঝুলকালির মতো ঝুলতে থাকে এবং তখন আমরা দিশেহারা হয়ে পার্থিব চিন্তাগুলি ক'রে ফেলি, বিশেষ জাগতিক উদ্দেশ্যে নামায প'ড়ে ফেলি। ঠিক যেন দরগায় মানত করার মতো। অনেক সময়ে আমাদের নামাযের পিছনে পার্থিব লক্ষ্য তথা ব্যক্তিগত সাধ-আহ্লাদের সফলতার কামনা কাজ করে। নামায যদি একেবারেই আল্লাহর জন্য না হয়, আল্লাহকে খুশী করার জন্য না হয়, বিশুদ্ধ না হয়, তা হলে এই অর্থে তার মধ্যেও অংশীবাদিত্ব ঢুকে পড়তে পারে।

অর্থাৎ দেখা গেল যে, মূর্তিপূজা না ক'রেও অংশীবাদীতে পরিণত হওয়ার ঝুঁকি রয়ে যেতে পারে। কারণ দেহের, মনের, নিজের জ্ঞান ও ধ্যান-ধারণার মূর্তিই সবচেয়ে বড় মূর্তি। অথচ আমাদের মন এই সত্যটি স্বীকার করতে চায় না।

সূরা **ক্বাফ**। আয়াত ৩২-৩৫। এখানে আল্লাহ একটি সুন্দর কথা বলেছেন। পরকালের একটি বিষয়কে বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ

অর্থাৎ দেখা গেল যে, মূর্তিপূজা না ক'রেও অংশীবাদীতে পরিণত হওয়ার ঝুঁকি রয়ে যেতে পারে। কারণ দেহের, মনের, নিজের জ্ঞান ও ধ্যান-ধারণার মূর্তিই সবচেয়ে বড় মূর্তি। অথচ আমাদের মন এই সত্যটি স্বীকার করতে চায় না।

বলছেন:

যারা না দেখে দয়াময় আল্লাহকে ভয় করত এবং বিনীত চিত্তে তাঁরই নিকট উপস্থিত হত।

এখানে আল্লাহ বিনীতভাবে ভীত সংকুচিত চিত্তে নামাযে দণ্ডায়মান হওয়াকে বুঝাচ্ছেন। অথচ তিনি ‘নামায’ শব্দটিকে ব্যবহার না ক’রে কত সুন্দর ব্যক্তিগত ভঙ্গিতে বলেছেন-তাঁরই নিকট উপস্থিত হত।

কত সুন্দর ব্যক্তিগত ভঙ্গিতে বলেছেন-তাঁরই নিকট উপস্থিত হত। কাকে ভয় করার প্রসঙ্গ এখানে এসেছে? আল্লাহকে। কিভাবে তাঁকে ভয় করা হবে?

মানুষে মিথ্যা কোনো কিছু ভয় পেতে পারে না। হয় সে তাকে ভয় পাবে যা সত্য এবং ভয়ঙ্কর, না হয় সে তার নিজেরই মনের ভুল ধারণাকে ভয় পাবে। আল্লাহকে তো দেখা যাচ্ছে না বা দেখা যায় না ব’লে আমরা ব’লে থাকি। কিন্তু তিনি যে সত্য সে ব্যাপারে যদি আমাদের কোনা সন্দেহ না থাকে, তাহলে তাঁকে যে দেখতে পাচ্ছি না-এই ঘটনাটিই তো তাঁকে ভয় পাওয়ার একটি প্রধান কারণ হতে পারে। আমি যদি তাঁকে বিশ্বাস করি, তাহলে অবশ্যই আমাকে এ কথা বিশ্বাস করতে হবে যে বিচার দিনে আমাকে তাঁর

তিনি যে সত্য সে ব্যাপারে যদি আমাদের কোনো সন্দেহ না থাকে, তাহলে তাঁকে যে দেখতে পাচ্ছি না- এই ঘটনাটিই তো তাঁকে ভয় পাওয়ার একটি প্রধান কারণ হতে পারে। আমি যদি তাঁকে বিশ্বাস করি, তাহলে অবশ্যই আমাকে এ কথা বিশ্বাস করতে হবে যে বিচার দিনে আমাকে তাঁর মুখোমুখি হতে হবে। এবং আমি যদি এখানে খারাপ কাজ করি তাহলে তাঁর মুখোমুখি হলে কী অবস্থা হতে পারে তা আমার বিশ্বাসের প্রবলতা অনুযায়ী আমার অন্তরে অনুভূত হওয়ার কথা।

মুখোমুখি হতে হবে। এবং আমি যদি এখানে খারাপ কাজ করি তাহলে তাঁর মুখোমুখি হলে কী অবস্থা হতে পারে তা আমার বিশ্বাসের প্রবলতা অনুযায়ী আমার অন্তরে অনুভূত হওয়ার কথা। আমি যদি তাঁকে এখানে চর্ম চক্ষু দ্বারা দেখতাম, বাইরের চোখ দ্বারা, অন্তরের চোখ দ্বারা নয়, তাহলে হয়তো তাঁকে ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেতাম না। আমার দৃষ্টি ঝলসে যেত। -মূসা (আ.) তাঁকে দেখতে চেয়েছিলেন অথচ তূর পাহাড় জ্ব’লে গিয়েছিল। কিংবা একই সঙ্গে তাঁকে দেখে অন্যান্য কাজ-কাম করা আমার পক্ষে সম্ভব হতো না। এ কারণে আল্লাহ দয়া পরবশ হয়ে আমাদের বাহ্যিক চোখ থেকে তিনি নিজেকে লুকিয়ে রেখেছেন। সুতরাং এখানে আমাদের জীবনযাপন তখনই সহজ হবে যখন আমরা তাঁকে বাহ্যিক চোখে দেখব না, কিন্তু অন্তরের চোখে দেখব। তাঁর দয়া দ্বারা তিনি তাঁর এবং আমাদের মাঝে যে পর্দা টেনে দিয়েছেন, এই পর্দাই মূলত আমাদের স্বাধীনতা। আমরা একটু চিন্তা করলেই কথাটির মর্মার্থ বুঝতে পারব।

আমাদের ভয় পাবার জন্য শুধু এটুকু ভাবাই যথেষ্ট যে তিনি পরম সত্য অথচ তা সত্ত্বেও আমরা তাঁকে দেখছি না, এবং আমাদেরই

আমাদের ভয় পাবার জন্য শুধু এটুকু ভাবাই যথেষ্ট যে তিনি পরম সত্য অথচ তা সত্ত্বেও আমরা তাঁকে দেখছি না, এবং আমাদেরই অজ্ঞতারই অবসরে তিনি আমাদেরকে আমাদের কুকর্মে বা কুচিন্তায় রত অবস্থায় দেখছেন। সত্য লুকিয়ে থাকলেই তো তা ভয়ংকর হয়। মিথ্যা লুকিয়ে থাকলে তা বরং ভয়ংকর হয় না, কারণ মিথ্যা মানে একটি প্রকাশ্য ভ্রান্তি- গোপন মিথ্যা ব’লেই কিছু থাকতে পারে না। মিথ্যা গোপন হলে সাথে সাথে নেই হয়ে যায়। এজন্য আল্লাহ বলেছেন যে মানুষ প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে আছে এবং ইবলিস প্রকাশ্যে শত্রু। ভয়ংকর ব্যাপার!

অজ্ঞতারই অবসরে তিনি আমাদেরকে আমাদের কুকর্মে বা কুচিন্তায় রত অবস্থায় দেখছেন। সত্য লুকিয়ে থাকলেই তো তা ভয়ংকর হয়। মিথ্যা লুকিয়ে থাকলে তা বরং ভয়ংকর হয় না, কারণ মিথ্যা মানে একটি প্রকাশ্য ভ্রান্তি-গোপন মিথ্যা ব'লেই কিছু থাকতে পারে না। মিথ্যা গোপন হলে সাথে সাথে নেই হয়ে যায়। এজন্য আল্লাহ বলেছেন যে মানুষ প্রকাশ্য ভ্রান্তি তে আছে এবং ইবলিশ প্রকাশ্য শত্রু। ভয়ংকর ব্যাপার!

আমি যখন পরীক্ষার খাতায়, অর্থাৎ উত্তরপত্রে, কোনো প্রশ্নের উত্তর লিখতে থাকি, এবং শিক্ষক যদি আমার উত্তর লিখতে থাকা অবস্থায় আমার খাতার দিকে তাকিয়ে থাকেন, তখন ভয় বা লজ্জায় আমি সুন্দরভাবে লিখতে পারি না। কিন্তু শিক্ষক যদি আমার খাতার দিকে তাকিয়ে না থাকেন, বরং তিনি শুধু আমার সামনে উপস্থিত থাকেন, তাহলে আমি অনায়াসে লিখে যেতে পারি। আবার পরীক্ষার কক্ষে শিক্ষক যদি আদৌ না থাকেন, তাহলেও হয়তো কেউ কেউ একেবারেই লিখতে পারবে না, কারণ তখন তারা নিজেরা চিন্তা ক'রে কিছু লেখার চেষ্টা না ক'রে বরং নকল করার চিন্তায় মশগুল থাকবে। আর এভাবে আসল কাজটি ঘটবে না।

তাহলে দেখা গেল যে, আল্লাহ যে আমাদের চর্মচক্ষু থেকে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছেন, এ হলো তাঁর দয়া। তিনি তাঁর দয়ার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেছেন ব'লে আমরা আবার আমাদের অজ্ঞতা আর অহংকার বশত তাঁর এক ধরনের অনুপস্থিতিকে তাঁর অনস্তিত্ব হিসেবেই ব্যাখ্যা ক'রে বসি। ফলে তাঁকে আর ভয় করি না। তাই আল্লাহ বলেছেন-যারা না দেখে দয়াময় আল্লাহকে ভয় করত। কথাটির এই গূঢ় অর্থ বুঝতে না পারলে প্রশ্নই রয়ে যায়ঃ যে-আল্লাহ *দয়াময়*, তাঁকে আবার ভয় করার দরকার কী**?** কিন্তু এখন তো আমরা বুঝলাম, যিনি দয়াময় তাঁকেই তো ভয় করা দরকার। তা না হলে তাঁর দয়াই আমার ধ্বংসের কারণ হবে। কারণ, এমন এক সময় আসবে যখন আমার অন্তর তাঁর উপস্থিতি একেবারেই টের পাবে না। তাদের মন উদ্ভ্রান্ত, দিশেহারা হয়ে যাবে। তাই আল্লাহ বলছেনঃ যারা আমার সাক্ষাৎ লাভের আশা রাখে না, আমি তাদেরকে ছেড়ে দিই, যেন তারা নিজেদের অবাধ্যতায় দিশেহারা অবস্থায় ঘুরে বেরায় (সূরা **ইউনুস,** আয়াত **১১**)।

অর্থাৎ তারা দিকভ্রান্তির ফাঁদে আটকে যায়। মানসিক গোলক-ধাঁধা।

যে বাবা-মা তাদের সন্তানকে অত্যন্ত বেশি মাত্রায় প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন, তারা সন্তানের ধ্বংসেরই কারণ হন। কারণ সন্তান তখন বাবা-মাকে অন্তরের সঠিক জায়গায় স্থাপিত করতে পারে না। তাদেরকে ভয় পায় না এবং নিজের আচরণকে শুধরে নেয়ার সুযোগ পায় না।

এই কথাগুলির আলোকে আমরা যদি সালাত বা নামাযকে বিবেচনা করি, তাহলে বুঝতে পারি যে নামায হলে আল্লাহর কাছে নিজের গোটা অতীত এবং অনির্দিষ্ট বর্তমানেরই পুরোটাই নিয়ে হাজির হওয়া। অতীত নিয়ে হাজির হওয়া, এই অর্থে যে, আমি আজীবন তাঁর কাছ থেকে যেভাবে দূরে স'রে গেছি, বা যেভাবে দূরে স'রে থেকেছি, এবং যার কারণে আমি ভ্রান্ত আচরণ করেছি, তার ফল যদি তিনি আমাকে দিয়ে দেন, আজ হোক আর কাল হোক, কিংবা পরকালে, তাহলে তা নিশ্চয়ই খুব সুখকর হবে না। এ কারণে তাঁকে ভয় পাওয়া ছাড়া আমার কোনোই গতি নেই। আবার গোটা ভবিষ্যৎকে নিয়ে তাঁর সামনে উপস্থিত হওয়ার অর্থ হলো এই যে, আজ আমি তাঁর অন্ধের মতো উপস্থিত হয়েছি, কিন্তু কাল পরকালে হাশরের মাঠে তাঁর সামনে যদি উপস্থিত হয়ে এ কথা জেনে যাই যে গতকাল নামাযের মধ্যে আমি তাঁর সামনে অবহেলাপূর্ণভাবে উপস্থিত হয়েছিলাম, তাহলে আমাকে লজ্জিত হতে হবে।

সুতরাং নামায হলো আল্লাহর সংগে বান্দার ব্যক্তিগত প্রেমের ও আনুগত্যের, মান-অভিমানের সম্পর্ক। নামায হলো দরবারে হাজির হওয়ার একটি প্রক্রিয়া। একটু সাবধানে এই শব্দগুচ্ছটিকে বিবেচনা করুন-'বিনীত চিত্তে উপস্থিত হওয়া'। ঠিক যেন আমি রাজার দরবারে কিংবা বিচারালয়ে উপস্থিত হচ্ছি। যেখানে স্বয়ং রাজা কিংবা মাননীয় বিচারক, যিনি আমার সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ তথ্য-প্রমাণ-সাক্ষ্য

নামায হলো আল্লাহর সংগে বান্দার ব্যক্তিগত প্রেমের ও আনুগতের, মান-অভিমানের সম্পর্ক। নামায হলো দরবারে হাজির হওয়ার একটি প্রক্রিয়া।

আগে থেকেই সংরক্ষিত ক'রে রেখেছেন, আমার দিকে তাকাবেন এবং আমাকে বিচার বিশ্লেষণ ক'রে আমাকে একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর মধ্যে ফেলবেন। এই জাতীয় চিন্তা থেকে যে বুদ্ধিবৃত্তি আসে, তার নাম সাবধানতা, সচেতনতা। এবং এই জাতীয় বিশ্বাস থেকে যে স্মরণ বা স্মৃতি উদিত হয়, তা অন্তরকে বৃহৎ থেকে বৃহত্তর গণ্ডিতে স্থাপিত করে। হাশরের মাঠে যাঁর সঙ্গে দেখা হবে, আজ আমি অন্য কেউ নয়, ঠিক তাঁর সামনেই দাঁড়িয়েছি। নামাযের সময়ে যদি এই কথাটি আমাদের স্মরণে থাকে, তাহলে তার অর্থ হবে এই যে, আমি যেন হাশরের মাঠেই তাঁর সামনে দাঁড়িয়েছি। এভাবে নামায অন্তরকে যাবতীয় পার্থিবতা এবং পার্থিবতার বেড়াজাল তথা মায়াজাল অতিক্রম করতে সাহায্য করে। কিন্তু সঠিক *বোধ* এবং *নিয়ত* নিয়ে নামাযের অনুষ্ঠান পালন না করলে এই ভাব মনে জাগে না।

সূরা **মোজাম্মেল** আয়াত ৬-৮:

উপাসনার জন্য রাত জাগা গভীর মনোযোগ ও হৃদয়ঙ্গম করার পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল। দিনের সময়ে রয়েছে তোমার জন্য অতিশয় কর্মব্যস্ততা। সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর এবং একনিষ্ঠভাবে তাতে মগ্ন হও।

কথাটি আল্লাহ রসূল (স.)-কে বলছেন। আল্লাহ অন্য এক আয়াতে বলেছেন-আমি তোমাদেরকে রাত্রি দান করেছি বিশ্রামের জন্য। তোমরা কি তা লক্ষ কর না?

তিনি সেই সত্তা যিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন রাত, যেন তোমরা তাতে বিশ্রাম কর এবং দিন সৃষ্টি করেছেন দেখার জন্য। নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে সে কওমের জন্য যারা মনোযোগ সহকারে শোনে।

(সূরা **ইউনুস,** আয়াত-৬৭)

তিনিই আল্লাহ্, যিনি তোমাদের জন্য রাত্রি সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা তাতে বিশ্রাম করতে পার এবং দিবসকে করেছেন আলোকময়। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তো মানুষের প্রতি বড়ই অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না।

(সূরা **মু'মিন,** আয়াত-৬১)

আল্লাহই মানুষের জান কবজ করেন তার মৃত্যুর সময় এবং যার মৃত্যু আসেনি তারও নিদ্রাকালে। অতঃপর যার জন্য তিনি মৃত্যুর ফয়সালা করেন তার প্রাণ তিনি রেখে দেন এবং অন্যানগুলো এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ছেড়ে দেন। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল লোকদের জন্য।

(সূরা **যুমার,** আয়াত-৪২)

আমিই তোমাদের নিদ্রাকে করেছি আরাম দানকারী, এবং রাতকে করেছি আবরণ, আর আমিই ক'রে দিয়েছি দিবসকে জীবিকা অর্জনের সময়।

(সূরা **নাবা,** আয়াত-৯-১১)

বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে আজ আমরা রাত এবং দিনের পরিস্থিতিতে মানুষের দেহের অবস্থার পার্থক্য কী তা স্পষ্টভাবে জানতে পেরেছি। রাতে মানুষের স্বাভাবিকভাবেই ঘুম পায়। গায়ের তাপমাত্রা রক্তচাপ হরমন প্রবাহ ইত্যাদি সবকিছুর ক্ষেত্রে একটি সাধারণ পরিবর্তন আসে; যে কারণে শরীর ঝিমিয়ে আসে, অর্থাৎ অঙ্গ-প্রতঙ্গ বিশ্রাম নিতে থাকে, এবং শারিরীক দুর্বলতা স্পষ্ট হতে থাকে। আর এভাবে *বিশ্রাম গ্রহণ করা অত্যন্ত সহজ হয়*। কিন্তু শরীর যেই ঝিমিয়ে আসতে থাকে, তখন আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলি, যারা শরীরের প্রবণতাকে আশ্রয় ক'রেই বেঁচে থাকে, এবং প্রকশিত হতে চায়, সেই সাথে ঝিমিয়ে পড়ে। তখন গভীর মনোযোগ সহজ হয়। আর মনোযোগ সহজ হলে মনোযোগের বিষয়কে হৃদয়ঙ্গম করাও সহজ হয়। এ কথাটি অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত এবং সন্দেহের একেবারে উর্ধ্বে। তাই আল্লাহ রসূল (স.)-কে এই তথ্যটি জানিয়ে দিচ্ছেন। রাত জেগে যে উপাসনা, তা হতে পারে নামায, তাসবিহ্ তাহলীল করা, ধ্যান, কোরআন আবৃত্তি, কোরআন পাঠ, কোরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা, ইত্যাদি। এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, নামায দেহ-মনের বহির্মুখী প্রবণতাগুলিকে উল্টো দিকে প্রবাহিত ক'রে ভিতরকে বৃহত্তর মাত্রায় ভারসাম্যপূর্ণ ক'রে দেয়। যে উদ্দেশ্যে নামায আদায় করা হয়, সে উদ্দেশ্যের প্রতি সম্মান এবং মমত্ববোধ না থাকলে নামায আদায়ের কোনো মানেই হয় না। তা যদি হতো, তাহলে আল্লাহ্ মদ্যপান করা অবস্থায় নামাযে দাঁড়ানোকে নিষিদ্ধ করতেন না। এ জন্যে আল্লাহ রসূল (স.)-কে বিশেষ ক'রে রাতে নামায পড়ার জন্যে বারবার তাগিদ দিয়েছেন।

সূরা **দাহর** আয়াত ২৬-এ আল্লাহ বলছেন:

রাত্রিতে তাঁর প্রতি সিজদায় অবনত হও এবং রাত্রির দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

সূরা **'আলা** আয়াত ১৩-১৭:

অতঃপর সেখানে সে মরবেও না বাঁচবেও না। নিশ্চয়ই সাফল্য লাভ করবে সে যে পবিত্র এবং যে তার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে ও নামায পড়ে। কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও, যদিও পরবর্তী জীবন উৎকৃষ্টকর ও স্থায়ী।

আল্লাহ এখানে পরকালের প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে, অর্থাৎ পরকালে অবিশ্বাসীদের কী অবস্থা হবে সে কথা বলতে গিয়ে, তার কারণ ব্যাখ্যা করার সূত্র ধ'রে কথাগুলিকে বলেছেন। তিনি বলছেন-নিশ্চয়ই সাফল্য লাভ করবে সে যে পবিত্র এবং যে তার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে ও নামায পড়ে। এখানে 'এবং' টির ব্যবহার লক্ষ করুন। কেউ যদি অপবিত্রতার মধ্যে প্রবেশ নাও করে এবং সে পবিত্র থাকে, যে কোনো উপায়েই হোক, তবুও তার সাফল্য আসবে না, যদি সে তার প্রতিপালকের নাম স্মরণ না করে, এবং নামায না পড়ে। আবার কেউ যদি তার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে এবং নামায পড়ে অথচ নিজেকে পবিত্র না রাখে বা নিজের পূর্ববর্তী অপবিত্রতার জন্য লজ্জিত না হয়, এবং নিজেকে পবিত্র রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা না করে, তাহলে সেও সফল হবে না।

আরেকটি জিনিস লক্ষণীয়: আমরা যেমন আগে দেখেছিলাম যে, নামায পড়ার উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর স্মরণকে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করা, এবং সেই প্রসঙ্গে এও বলেছিলাম যে, এই কথার সূত্র ধ'রে অনেকে বলে যে আল্লাহকে স্মরণ করতে পারলে নামায পড়ার দরকারও হয় না, এবং সেই প্রসঙ্গে আমরা আমাদের অভিমত এইভাবে ব্যক্ত করেছিলাম যে, নামায পড়ার উদ্দেশ্য আল্লাহকে স্মরণ করা হলেও নামায ছাড়া তাঁকে অন্য কোনো ভাবে স্মরণ করা মূলত তাঁর আদেশকে অমান্য করা। কেউ যদি আমাকে ভালোবাসতে চায়, তো নিশ্চয়ই আমার খুশি হওয়ারই কথা। সে যদি আমার উপকার করতে চায়, তো আমার খুশি হওয়ারই কথা। কিন্তু আমি যদি তাকে বলি-আমাকে এই ভাবে ভালোবাস, এই জিনিসটি দিয়ে, এই উপায়ে আমাকে খুশি করার চেষ্টা কর, কিন্তু সে যদি আমার সেই ইচ্ছাকে সম্মান প্রদর্শন না করে, তাহলে সে আমার জন্য আমাকে ভালোবাসছে না, নিছক তারই প্রয়োজনে আমাকে ভালোবাসছে। তাহলে, আল্লাহ যেভাবে তাঁকে স্মরণ করতে বলছেন, আমরা সেভাবে যদি তাঁকে স্মরণ করতে না চেয়ে নিজের মন-গড়া উপায়ে তাঁকে স্মরণ করতে চাই, তাহলে তা হবে তাঁকে বাদ দিয়েই তাঁকে ভালোবাসা। অর্থাৎ একটি আত্মবিরোধ। অর্থাৎ স্বার্থপরতা।

'ইহকালের ওপর পরকালকে প্রাধান্য দেওয়া আসলে কাকে বলে? তা দ্বারা কী বুঝায়?' তা অধিকাংশ মুসলমানই জানেন না। আর তার কারণেই আজ আমরা কাফেরদের সঙ্গে বা অবিশ্বাসীদের সঙ্গে যে ঝামেলায় লিপ্ত হয়েছি, তা মূলত ইহকাল-কেন্দ্রিক, পরকাল-কেন্দ্রিক নয়।

এজন্য আল্লাহ এখানে স্পষ্ট ক'রে দুটি কথাকেই পাশাপাশি যুক্ত করেছেন-যারা তাদের প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে 'ও' নামায পড়ে। স্মরণও করতে হবে, নামাযও পড়তে হবে। নামায প'ড়ে স্মরণহীন হলে চলবে না। আবার স্মরণ ক'রে নামাযহীন হলেও চলবে না।

এই আয়াতে নামায সম্পর্কিত সবচেয়ে যে গূঢ় তথ্যটি প্রদান করা হয়েছে, তা রয়েছে একটু পরেই: কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও। যদিও পরবর্তী জীবন উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী। আল্লাহর স্মরণ ও সঠিক নামায কখনোই সংগঠিত হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ইহকালের ওপর পরকালকে প্রাধান্য না দিচ্ছি।

আমার যতদূর মনে হয়, এবং মানব মন সম্পর্কে প্রতিটি ব্যক্তির যেমন ব্যক্তিগত কিছু অভিজ্ঞতা থাকে সেই অভিজ্ঞতা আমার যতটুকু রয়েছে, তা যদি সঠিক এবং কার্যকর হয়, তাহলে আমি অত্যন্ত হতাশার সঙ্গে এ কথা বলব যে, 'ইহকালের ওপর পরকালকে প্রাধান্য দেওয়া আসলে কাকে বলে? তা দ্বারা কী বুঝায়?' তা অধিকাংশ মুসলমানই জানেন না। আর তার কারণেই আজ আমরা কাফেরদের সঙ্গে বা অবিশ্বাসীদের সঙ্গে যে ঝামেলায় লিপ্ত হয়েছি, তা মূলত ইহকাল-কেন্দ্রিক, পরকাল-কেন্দ্রিক নয়। আমি বলছি না যুদ্ধ-বিগ্রহ রক্তপাত এগুলোর কোনো প্রয়োজন নেই। এগুলোর প্রয়োজন খুব বেশিও হতে পারে। কিন্তু কোন বিষয়কে কেন্দ্র ক'রে আমাদের কোন্দল হচ্ছে? ইহকালকে? তাহলে আমরা তো তাদেরই কাতারভূক্ত হয়ে গেলাম। তারা যে উদ্দেশ্যে তাদের শক্তি ব্যয় করছে, আমরাও ঠিক সেই উদ্দেশ্যেই আমাদের শক্তি ব্যয় করছি। 'ইহকালের ওপর পরকালকে প্রাধান্য দেয়া' কথাটির জীবনে কিছু প্রয়োগ রয়েছে। যেমন, আমি যখন কিছু ভোগ করব, তখন প্রতিটি ভোগের সাথে আমাকে পরকালের ভোগের কথা স্মরণ করতে হবে, এভাবে যে, এখানে যদি আমি খুব বেশি ভোগ করি, তাহলে প্রথমত, পরকালকে আমি ভুলে যাব, তাঁর স্মরণ আমার

মধ্যে সক্রিয় হবে না, এবং দ্বিতীয়ত, পরকালে আমার ভোগের যোগ্যতা হয়তো আমি হারাব। সুতরাং আমি এখানে যখনই কিছু ভোগ করি, তখনই যেন এ কথা স্মরণ ক'রে তার কিছু অংশ ত্যাগ করার জন্য আন্তরিক তাগিদ অনুভব করি। আবার, আমি যখন দুঃখ'কষ্ট ভোগ করব, তখন যদি পরকালের সুখ-সম্ভাবনাকে স্মরণে রাখি, তাহলে আমি নিশ্চয়ই এখানে সামান্য দুঃখকষ্টে অস্থির হয়ে উঠব না, এবং দুঃখ-কষ্টে কারণে আমার মনটাকে সংকীর্ণ ক'রে রাখব না। দায়িত্ব পালন থেকে বিরত হব না। সততা থেকে দূরে স'রে দাঁড়াব না।'

পরকালের জীবনকে আমরা কামনা করি, কিন্তু প্রাধান্য দেই কি? কামনা করা আর প্রাধান্য দেয়া কি এক কথা? আল্লাহ কি শুধু পরকালকে কামনা ক'রেই ক্ষান্ত হতে বলেছেন? বরং তিনি তো তাকে প্রাধান্য দিতে বলেছেন।

আমরা তো অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'গাছেও খাব তলাও কুড়াব' নীতিকে জীবনের অংশ ক'রে নিয়েছি। কিন্তু তা হতে পারে না। যার জন্য

পৃথিবীতে সবকিছু পছন্দ ক'রে বিভ্রান্ত হওয়া যায়, কিন্তু একটি জিনিস পছন্দ ক'রে বিভ্রান্ত হওয়ার কোনো সুযোগ থাকে না। তা হলো নামায। কারণ, জিনিসটি পৃথিবীতে রয়েছে বটে, তবে তা পৃথিবীর নয়।

আল্লাহ বলছেন-যে তার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে ও নামায পড়ে। কিন্তু তোমরা তো পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও। অর্থাৎ পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিলে সঠিক নামাযই হবে না। প্রতিপালকের স্মরণ করাই সম্ভব হবে না। তখন যে স্মরণ হবে, তা হবে নিছক আঙ্গুলে তসবি গোনা। তখন নামায 'পড়া' হবে, কিন্তু নামায আদায় বা প্রতিষ্ঠা করা হবে না। নামায সংরক্ষণ করা হবে না।

এ থেকে আমরা নামায সম্পর্কে যে গূঢ় তথ্যটি পাচ্ছি তা হলো এই যে, সঠিক নামায ইহকালে আদায় করা হয় বটে, তবে তা জাগতিকতার উর্ধ্বে। যে কারণে রাসূল (স.) বলতেন-তোমাদের পৃথিবীতে আমার তিনটি জিনিস প্রিয়: নামায, সুগন্ধি, নারী। তিনি নামাযকে পৃথিবীর জিনিস হিসাবে চিহ্নিত করেছেন এবং তাকে প্রিয় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, পৃথিবীতে সবকিছু পছন্দ ক'রে বিভ্রান্ত হওয়া যায়, কিন্তু একটি জিনিস পছন্দ ক'রে বিভ্রান্ত হওয়ার কোনো সুযোগ থাকে না। তা হলো নামায। কারণ, জিনিসটি পৃথিবীতে রয়েছে বটে, তবে তা পৃথিবীর নয়।

আমি খেয়াঘাটে গিয়ে যদি বলি-আমি এখন খেয়াকে অত্যন্ত পছন্দ করি, তাহলে আমার দ্রুত পার হয়ে যাওয়া সহজ হবে, কারণ আমি যে-পারে ব'সে খেয়াকে ভালবাসছি, খেয়া সে-পারে সহজলভ্য বটে, তবে সে-পারের জিনিস সেটা নয়। এ-পারের যাত্রীর কাছে তা এসেছে ও-পার থেকে।

যখন জাহাজ ডুবু-ডুবু অবস্থায় চ'লে আসে, তখন আমি যদি বলি -এ জাহাজে রক্ষিত ছোট্ট লাইফবোটটিকে আমি অত্যন্ত পছন্দ করি, তাহলে আমার পছন্দ নিশ্চয়ই আমার অনেক উপকার করবে।

নামায হলো একটি খেয়া, যাতে ক'রে আমরা আমাদের অজ্ঞতা নফস্ অনিশ্চয়তা পাপ ইত্যাদির মিলিত মহাসমুদ্র পাড়ি দিতে পারি। এবং নামায হলো পার্থিব জীবনের একেবারেই বিপরীত কিছু। অর্থাৎ পার্থিব জীবনে এমন যদি কিছু থেকে থাকে যা এই জীবনের মায়াকেই ধ্বংস করে, যা এই জীবনেরই অতীত, তাহলে তা হলো নামায।

আপনি এখানে যদি একশ' বছরও বেঁচে থাকেন, কিংবা দুইশ' বছর, সেই জীবন যদি নিরাপত্তার সাতে ধারাবাহিকতা পায়, তবুও তা *একটাই* জীবন। অথচ এরই মধ্যে লুকিয়ে রাখা হয়েছে আপনার অনন্ত জীবনের প্রবেশের দরজা, এবং সে দরজায় আপনি দিনে কমপক্ষে পাঁচবার গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন। বিশ্বাস যদি এই অর্থে প্রবল হয়ে থাকে, তাহলে দেখবেন আপনি যত বারই নামাযে দাঁড়াচ্ছেন, তত বারই যেন হাশরের মাঠেই আল্লাহর সামনে দাঁড়াচ্ছেন।

তাহলে পরকালকে স্মরণ করতে আমাদের খুব বেশি দূরে যাওয়ার দরকার নেই। শুধু একটু দূর থেকে তাকিয়ে দেখুন: আপনার সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সময়টুকু। তার মধ্যে যে ছেড়া-ছেড়া, ভাঙ্গা-ভাঙ্গা সময়টুকু আপনি নামাযের জন্য ব্যয় করছেন। ঐ সময়টুকু কত মূল্যবান! কত সম্মানিত! কারণ আপনি এখানে যদি একশ' বছরও বেঁচে থাকেন, কিংবা দুইশ' বছর, এবং সেই জীবন যদি নিরাপত্তার সাথে ধারাবাহিকতা পায়, তবুও তা *একটাই* জীবন। অথচ এরই মধ্যে লুকিয়ে রাখা হয়েছে আপনার অনন্ত জীবনে প্রবেশের দরজা, এবং সে দরজায় আপনি দিনে কমপক্ষে পাঁচবার গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন। বিশ্বাস যদি এই অর্থে প্রবল হয়ে থাকে, তাহলে দেখবেন আপনি যত বারই নামাযে দাঁড়াচ্ছেন, তত বারই যেন হাশরের মাঠেই আল্লাহর সামনে দাঁড়াচ্ছেন। এবং আপাতত আপনাকে হয়তো কল্পনার দ্বারা বিষয়টিকে এভাবে ভাবতে হচ্ছে। কিন্তু আসলে এটি সত্য এবং কল্পনা নয়। অন্যান্য বিষয়ে আপনার কল্পনা যত দুর্বল হতে থাকবে, এই কল্পনাটি তত শক্তিশালী হয়ে বাস্তবতায় রূপলাভ করবে। তখন আর কোনোকিছু না দেখে বিশ্বাস করার প্রয়োজন হবে না, বরং অন্তর জানবে যে সে দেখছে।

সুতরাং নামায হলো জীবনের পারলৌকিক রূপের ধারক, যেন একটি টাইম মেশিন, য বাড়ির মধ্যে কোথাও লুকানো রয়েছে, এবং সবাই যখন নীরবে নিভৃতে ঘুমিয়ে পড়ে, তখন আমি সেখানে গিয়ে তার মধ্যে চ'ড়ে বসে তাকে চালু ক'রে দিতেই তা আমাকে অতীতে বা ভবিষ্যতে দূর কোনো জগতে নিয়ে গেল।

সূরা মোজাম্মেল আয়াত ২০। এখানে আল্লাহ কী বলছেন তা বিবেচনা করবার সময়ে পূর্ববর্তী আয়াতের মর্মার্থটিকে আরেকক বার অনুভব করার চেষ্ট করি:

> নামায যথাযথভাবে পড়, যাকাত প্রদান কর, এবং আল্লাহকে দাও উত্তম ঋণ। তোমরা তোমাদের আত্মার মঙ্গলের জন্য ভালো যা কিছু আগে সঞ্চয় করবে, তোমরা তা আল্লাহর নিকট উৎকৃষ্টতর রূপে এবং পুরষ্কার হিসেবে বর্ধিত পরিমাণে পাবে। তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর আল্লাহর নিকট। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল এবং পরম দয়ালু।

এই আয়াতটিকে অত্যন্ত সরল ব'লে মনে হচ্ছে, এবং মনে হচ্ছে যে আয়াতটিতে একটি মাত্র বিষয় আলোচিত হয়েছে। কিন্তু আসলে এই আয়াতটি অত্যন্ত বহুমাত্রিক। আল্লাহ শুরু করছেন এ কথা দিয়ে- নামায 'যথাযথভাবে' পড়। 'যথাযথভাবে' শব্দটি যে কেন গুরুত্বপূর্ণ তা আমরা আগেই দেখেছি। তার সাথে বলছেন-যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহকে দাও উত্তম 'ঋণ'। এখানে 'ঋণ'

শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। আমরা নামায পড়ি এবং যাকাত দেই, যদি শুধু এই উদ্দেশ্যে যে আল্লাহ আমাদেরকে তার বিনিময়ে এখানে খুব ভালো রাখবেন, তাহলে সেই নামায যদি সুন্দরভাবে পড়া হয়, যাকাত যদি পবিত্র টাকা থেকেই দেওয়া হয়, আমি তার ফল অবশ্যই এখান থেকে পাব। তখন এই রূপ বলা যাবে না যে, আমি নামায পড়িনি, এরূপ কেউ বলবে না যে, আমি যাকাত দেইনি। কিন্তু তার সব ফল যদি আমি এখানেই চাই, এবং আমাকে যদি তা দিয়েও দেয়া হয়, তাহলে পরকালে গিয়ে দেখব যে আমার ভাণ্ডার শূণ্য। এক আয়াতে আল্লাহ স্পষ্টভাবে ব'লে দিয়েছেন যে যারা তাদের সমস্ত ভালোকাজের ফল এখানেই চায় তারা পরকালে কোনো অংশ পাবে না। এই জন্য আল্লাহ বলছেন-আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও। অর্থাৎ তুমি যে নামায পড়ছ, যে যাকাত দান করছ; তা দিয়ে আমাকে ধন্য করছ এরূপ মনে করো না; তার বিনিময়ে তোমাকে এখানে সবই পেতে হবে, স্বার্থপরের মতো তুমি দেয়ার সঙ্গে-সঙ্গে হাত পেতে আবার নিতে চাও, এরকমটি ক'র না। বরং আল্লাহকে ঋণ দাও। অর্থাৎ তুমি ধ'রেই নাও যে, তুমি যা যা করছ তার কিছু বিনিময় পৃথিবীতে তোমাকে আমি দেব। তবে সব দেব না। এবং সব পাওয়ার জন্য হাত পেতে রেখ না। প্রস্তুত থেক না। সর্বদাই ঋণ হিসেবে কিছু গণ্য কর। তোমরা যেমন ব্যাংকে টাকা রাখ, তিলে তিলে জমা কর, যখন একটি সঞ্চয়ী স্কীম-এ তোমরা টাকা জমা করতে চাও, তখন তো হুট ক'রে মাঝপথে গিয়ে অর্ধেক টাকা ফেরৎ চাও না। সেরূপ আমৃত্যু আমার কাছে কিছু জমা রাখ। আমার কাছে জমা রাখার মানসিকতা যার নেই, সে আসলে পরকালকে বাদ দিয়ে ইহকালকে প্রাধান্য দেয়ার লোক।

এখন, এটিও হলো সাধারণ অর্থ। এই কথাটির একটি অসাধারণ অর্থও রয়েছে। এবং তা হলো আমাদের মনোভাব সম্পর্কে। আমরা নামায পড়ি, যাকাত দান করি, অথচ আর দশ জনকে দেখাতে চাই যেন আমার *নামায* গুরুত্বপূর্ণ নয়, আমি যে নামায *পড়ছি*, এটাই গুরুত্বপূর্ণ । যেন আমার যাকাত গুরুত্বপূর্ণ নয়, আমি যে যাকাত *দিচ্ছি*, এটাই গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ আর দশ জনের চোখের ওপর আমার ভালোত্ব নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। এই জাতীয় হালকামি দ্বারা আমরা মূলত সম্মান কামনা করি, মর্যাদা কামনা করি, স্বীকৃতি কামনা করি, এবং এই সবকিছুরই পরিণতি হিসেবে কামনা করি পার্থিব জগতের আনন্দ। এই জন্য আল্লাহ বলছেন যে, নামায যাকাত সবকিছুরই আগে অন্তরে এ কথা স্পষ্টভাবে ধ'রে নিতে হবে যে, এগুলির মাধ্যমে আমি আল্লাকে *ঋণ দিচ্ছি।* এই নিয়ত যতক্ষণ ঠিক না হবে, ততক্ষণ এগুলি ঠিক হবার কথা নয়। অর্থাৎ আমি এগুলির মাধ্যমে যে ভালো কাজ করব, তার পূর্ণ প্রতিদান এখানে পাই না, গ্রহণও করতে চাই না। আল্লাহ্ দিলেও আমি তাঁকে বলব যে, তুমি ফেরৎ নাও, এবং তা তাঁকেই দিয়ে দেব। অর্থাৎ তার কিছু অংশ অন্যান্য মানুষেরই মঙ্গলের উদ্দেশ্যে ব্যয় করব। এবং ইহকালের ওপর পরকালকে প্রাধান্য না দেওয়া পর্যন্ত তা কখনও সম্ভব নয়। সম্ভব কি? তাই তো আল্লাহ রসূল (স.)- কে বলতে শিখিয়েছেন:

আপনি বলুন: আমার নামায, আমার ইবাদত, আমার জন্ম-মৃত্যু সবই এক আল্লাহর জন্য।

(সূরা **আন'আম, ১৬২)**

ইহকালের চেয়ে পরকালকে যদি আমরা বেশি গুরুত্ব না দেই, তাহলে পরকালের চেয়ে ইহাকালকে যে পরিমাণ বেশি গুরুত্ব দেই, ঐ পরিমাণ গুরুত্ব বেশি দেওয়া হয়েছিল মনের শক্তিগুচ্ছের যে বিপথগামিতার জন্যে, বা আবেগগুচ্ছের যে এলোমেলো ভাবের জন্য, তা পরকাল সম্পর্কে আমাদের মধ্যে এ পরিমাণ উদাসীনতার পর্দা রচনা করে। ঠিক এই পর্দাটি নামাযে এসে উদাসীনতার সৃষ্টি করে এবং সে নামায আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছবে কি, আমরা বরং তখন এ কথা জানতে ব্যস্ত হয়ে যাই যে, তা পার্শ্ববর্তী অন্যান্য লোক-জনের

কাছে পৌঁছল কি না। অর্থাৎ আমি যে নামায পড়ছি, তা সবাই দেখল কি না। সূরা **মাউন** আয়াত ৪-৬। এখানে আল্লাহ কী বলছেন বিবেচনা করা যাক:

> সুতরাং দুর্ভোগ সেই সব নামায আদায়কারীদের যারা তাদের নামায সম্পর্কে উদাসীন। যারা তা করে লোক দেখানোর জন্য।

অর্থাৎ তারা নামায আদায়কারী। তার পরেও তারা উদাসীন। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, তারা নামাযের ব্যাপারে উদাসীন হলেও *লোকজনের* ব্যাপারে উদাসীন নয়। আর সে কারণেই এই উদাসীনতা সৃষ্টি হয়েছে। ইহকালকে পরকাল অপেক্ষা বেশি মূল্য দিলে সত্য এবং মনের মাঝে এরূপ পর্দা প'ড়ে যায়। আবার এই কথার অর্থ এই নয় যে, ইহকাল ত্যাগ করতে হবে। এই কথার অর্থ এও নয় যে, ইহকালের কোনো বিপদ-আপদ থেকে রেহাই পাওয়ার উদ্দেশ্যে কিংবা অভাব-অনটন থেকে রেহাই পাওয়ার উদ্দেশ্যে নামায পড়া যাবে না বা নামায পড়ার পর আল্লাহর কাছে সে সব উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করা যাবে না। তা অবশ্যই নয়।

সূরা **কুরাইশ** আয়াত ১-৪। এখানে আল্লাহ বলছেন:

> *যেহেতু কুরাইশদের আসক্তি আছে তাদের শীত ও গ্রীষ্মে সফরের। সেহেতু ওরা উপাসনা করুক এ গৃহের রক্ষকের, যিনি ওদেরকে ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং ভয় থেকে ওদেরকে নিরাপদ করেছেন।*

আল্লাহ বলছেন-যেহেতু তাদের দেশ-বিদেশ ঘুরতে মন চায়, শীত-গ্রীষ্মে সফর করতে মন চায়, সেহেতু তারা এই কা'বা ঘরের রক্ষকের উপাসনা করুক। অর্থাৎ পার্থিব সচ্ছলতাকে আরো নিশ্চিত করার জন্য তারা এ কাজ করুক। এ থেকেই প্রমাণ হচ্ছে যে সঠিকভাবে নামায পড়লে পার্থিব সচ্ছলতা এমনিতেই এসে যায়। সুযোগ সুবিধা কাজ কাম সচ্ছলতা এমনিতেই এসে যাবে। এবং প্রয়োজন মেটানোর জন্য আল্লাহর কাছ থেকে তা চেয়ে নেয়াও কোনো অপরাধের বিষয় নয়।

সঠিকভাবে নামায পড়লে পার্থিব সচ্ছলতা এমনিতেই এসে যায়। সুযোগ সুবিধা কাজ কাম সচ্ছলতা এমনিতেই এসে যাবে।

আবার এর অর্থ এও নয় যে, আমি ইহকালের চেয়ে পরকালকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছি। ত্যাগ এবং ভোগ এই দুইয়ের মাঝে ভারসাম্য কিভাবে স্থাপিত হয় তা সূরা **কাউসার** এ আল্লাহ সুন্দরভাবে বলেছেন:

> *নিঃসন্দেহে আমি তোমাকে প্রচুর কল্যাণ দান করেছি। সুতরাং তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামায আদায় কর এবং কোরবাণী কর।*

আল্লাহ ব'লে দিয়েছেন যে ইতিমধ্যেই আমি তোমাকে কল্যাণ দান করেছি। সে কল্যাণ ইহকালের এবং পরকালের। পরকালে তোমাকে কল্যাণ দান করা হবে-তোমাকে এই সংবাদ জানানো তো ইহকালের জন্য বড় কল্যাণ, কারণ এই সুসংবাদ শোনার সাথে সাথেই তোমার অন্তর দুশ্চিন্তামুক্ত হয়ে গেল। এই সংবাদ যেহেতু এখানে জানিয়ে ফেললাম, সেহেতু তোমার উচিৎ তোমার প্রতিপালকের মহিমা প্রকাশ করা, তাঁর কাছে প্রশংসা প্রেরণ করা, তাঁর উদ্দেশ্যে নামায পড়া এবং তাঁর উদ্দেশ্যে কোরবাণী করা। কেন কোরবাণী করতে হবে? আল্লাহ মঙ্গল দান করেছেন। এই মঙ্গল এক মহা মঙ্গল, যা পরকালে রসূল (স.) এর জন্যই

আমাকে যা দেওয়া হয়েছে তা শুধু আমাকে দেওয়া হয়নি। আমার মধ্য দিয়ে আরো কিছু লোকের অভাব মেটানোর জন্য আমাকে কিছু দেওয়া হয়েছে। আরো কয়েকজনকে দেওয়ার জন্য আমাকে কিছু দেওয়া হয়েছে। তা যদি না হতো, তাহলে আর দশ জনের সাথে আমার অন্তরের যে বন্ধন, তাকেই অস্বীকার করা হতো। সুতরাং আমি নিজেই যদি এ কথা স্বীকার না করি, তাহলে আর দশ জনের সাথে আমার অন্তরের যে বন্ধন তা অস্বীকার করব এবং তারই মাধ্যমে নিজেকে গুরুত্বহীন ক'রে তুলব। আর দশ জনের জীবনযাপনের ক্ষেত্রে আমার কোনো ভূমিকা নেই- এ কথাই স্বীকার ক'রে নিব। এরই নাম স্বার্থপরতা ও অকৃতজ্ঞতা।

সংরক্ষিতই আছে এবং তাঁর সমস্ত উম্মতগণ তা ভোগ করবেন। এই সংবাদ শোনা মানে খুশী হয়ে যাওয়া। এই সংবাদ শোনা মানে আমি যা কিছু পেলাম তা জানা। সুতরাং পাওয়ার বিপরীতে আমাকে এখন কিছু দিতে হবে। কোরবাণী দিতে হবে। ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। শুধু পশুর গলায় ছুরি দিলেই তা কোরবাণী হয় না। কোরবাণী করার একটি অর্থ হলো ত্যাগ বা sacrifice।

এই কথাটি দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে আল্লাহ আমাদের উপাসনার বিনিময়ে ইহকালে কল্যান দান করেন। আবার আমাদের পরকালে কল্যাণ দেবেন এই কামনা ক'রেও আমরা এখানে উপাসনা করব। আবার, কোনো কল্যাণ আমাদেরকে ইতোমধ্যেই দিয়ে ফেলেছেন-যদি এমন হয়, আমরা যদি তা বুঝতে পারি, তাহলে সেখানেই আমাদের কিছু কোরবাণী করা উচিৎ, ত্যাগ করা উচিৎ। কিছু পেয়েছি। আমাকে যা দেওয়া হয়েছে তা শুধু আমাকে দেওয়া হয়নি। আমার মধ্য দিয়ে আরো কিছু লোকের অভাব মেটানোর জন্য আমাকে কিছু দেওয়া হয়েছে। আরো কয়েকজনকে দেওয়ার জন্যে আমাকে কিছু দেওয়া হয়েছে। তা যদি না হতো, তাহলে আর দশ জনের সাথে আমার অন্তরের যে বন্ধন, তাকেই অস্বীকার করা হতো। সুতরাং আমি নিজেই যদি এ কথা স্বীকার না করি, তাহলে আর দশ জনের সাথে আমার অন্তরের যে বন্ধন তা অস্বীকার করব এবং তারই মাধ্যমে নিজেকে গুরুত্বহীন ক'রে তুলব। আর দশ জনের জীবনযাপনের ক্ষেত্রে আমার কোনো ভূমিকা নেই-এ কথাই স্বীকার ক'রে নিব। এরই নাম স্বার্থপরতা ও অকৃতজ্ঞতা।

সুপ্রিয় পাঠক! আমরা নামায সম্পর্কে অনেক বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তার প্রকৃতিটি কী তা উদ্‌ঘাটন করার চেষ্টা করেছি। এবং তা করতে গিয়ে আমরা এক বিন্দু কল্পনা বা স্বেচ্ছাচারিতার আশ্রয় নেইনি। আমরা পুরোপুরি পবিত্র কোরআনের তথ্যের প্রতি যত্নবান থেকেছি এবং আমরা এইটুকু জেনেছি যে নামায হলো আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের শ্রেষ্ঠতম উপায়। কিন্তু এই সাক্ষাৎ কখন ঘটে? যখন আমরা তাঁর 'নিকটে' এবং 'মুখোমুখি' গিয়ে উপস্থিত হই। তার আগ পর্যন্ত নিশ্চয়ই আমাদেরকে তাঁর এবং আমাদের মাঝে যে দূরত্ব রয়েছে তাকে ক্রমে ক্রমে ঘুচিয়ে ফেলতে হবে। এই নামাযই তাঁর এবং আমাদের মাঝখানের দূরত্বকে ঘুচিয়ে দেবে। এবং এই দূরত্ব ঘুচিয়ে দেবার অর্থই হলো এক পর্যায়ে তর এবং আমার দেখা হওয়া। তাই তো সূরা **'আলাক'** আয়াত ১৯-এ আল্লাহ বলছেন:

তুমি সিজদা কর ও আমার নিকটবর্তী হও।

তাহলে উদঘাটিত হলো যে:

- নামায সঠিকভাবে পড়ার আগে ঠিক করা দরকার আমি সঠিক উদ্দেশ্যে নামায পড়ছি কি না।
- নামায হলো বিশুদ্ধ মনোযোগ, কিন্তু জাগতিকতা ও অপবিত্রতা থেকে মনোবিয়োগ না ঘটা পর্যন্ত তা সংঘটিত হতে পারে না।
- পাপের পথে পিছিয়ে পড়া মানেই পূণ্যের পথে এগিয়ে যাওয়া। নামায এই উভয় কাজ সহজ ক'রে দেয় ব'লে তা নিজেই একটি শ্রেষ্ঠ পুণ্যের কাজ।
- নিজের দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় ঘটনাবলি থেকে নিজেরই নামাযকে আলাদাভাবে বিবেচনা করার প্রয়োজন রয়েছে। দিনের শেষে বিগত দিনের স্মৃতিকে স্মরণ করার জন্য শুধু সেই দিনটিতে সংঘটিত নামাযকে স্মরণ করাই যথেষ্ট।
- নামায দেহ-মন-আত্মায় এক যোগে তাওহীদ প্রতিষ্ঠিত করে। আর এভাবে তা ব্যক্তির দেহ-মন, রোগ-ব্যাধি, সমাজ-সম্পর্ক, বংশ-গোত্র, পরিবেশ, জীবনোপকরণ সবকিছুতেই বিশুদ্ধ ও সমৃদ্ধ করে।
- সঠিক উদ্দেশ্যে নামায আদায় না করলে সেই নামাযই ব্যক্তির ধ্বংসের কারণ হয়। কারণ নামায দেহ-মন তথা বাস্তবতার রূপান্তর ঘটায়। এই রূপান্তর অনাকাঙ্ক্ষিত দিকে ঘটতে থাকলে একটি সীমার পরে সেখান থেকে ফিরে আসা কঠিন হতে পারে। কারণ, আল্লাহ বলেছেন-(যে ব্যক্তি) যা উত্তম তা অস্বীকার করে, আমি অবশ্যই তার জন্য সহজ ক'রে দেব কঠোর পরিণামের পথ। সূরা **লাইল,** আয়াত-**৯-১০**।
- নামায মন পরিষ্কারের কাজ করে। এ কারণে তার মধ্যে মন পরিষ্কার নিয়ে চিন্তা করতে থাকলে নামাযের কাজ স্তব্ধ হয়ে গিয়ে নিজের অপরিচ্ছন্ন মনের কাজই চলতে থাকবে এবং এভাবে উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। সুতরাং সঠিক উপায়ে হলো নামাযে দাঁড়ানোর আগে *উদ্দেশ্য* বা *নিয়তকে* পরিষ্কার করা।
- নামাযকে পরম সম্পদ মনে ক'রে কিভাবে তাকে ভবিষ্যতের সম্পদ হিসেবেও রক্ষা করা যায় তা নিয়ে ভাবতে হবে। এই কথাটির একটি মর্মকে ব্যক্তি জীবনে এভাবে প্রয়োগ করা যায়: প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত আমি কতবার নামায আদায় করব তা নিয়ে ঠান্ডা মাথায় আগে-ভাগে ভেবে নিতে পারি। একই ভাবে, প্রতিদিন ঘুমাতে যাওয়ার আগে বিগত দিনটিতে আমি কী কী নামায আদায় করেছিলাম সে বিষয়ে ধ্যান ক'রে নিতে পারি। আমরা গোপন পাপের আনন্দের অনুভূতি বারবার স্মরণ করি, এমনকি তা নিয়ে অহংকার বা গর্বও করি। ফলে আমরা দিন দিন ধ্বংসের দিকে ধাবিত হতে থাকি। এই অভ্যাসটির স্থলে নিজের অতীতের এবং ভবিষ্যতের নামাযের কথা উপরোক্ত নিয়মে বারবার স্মরণ করার অভ্যাসটিকে স্থাপিত করলে অন্তঃকরণ দ্রুত থেকে দ্রুততর উন্নতির দিকে যেতে থাকবে। ধ'রে নিন যে আপনার বিগত দিনের সারাংশ হলো তাতে আপনি যে নামায আদায় করেছেন, তা।
- যে-নামায আল্লাহর উদ্দেশ্যে নয়, নামাযী তার মালিকানা অস্বীকার করতে পারে না। এ কারণে তাকে বারবার অন্যদেরকে তার নামায দেখাতে বাধ্য হতে হয় বা তা করতে তার মন চায়। নামায যদি কোনো মূল্যহীন জিনিস হতো, তাহলে তার প্রতি অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার ইচ্ছাই জাগত না। এ অবস্থায় ব্যক্তির নামাযই ব্যক্তিকে বেশি অহংকারী ক'রে দেয়। মনে রাখতে হবে যে, ধর্মচরণের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো পথভ্রষ্ট অহংকারকে ভারসাম্যপূর্ণ করা। এবং এও মনে রাখতে হবে

যে, দিগ্‌ভ্রান্ত অহংকার সত্যনিষ্ঠ আমিত্বের আদেশ উপদেশের কঠোরতাকেই অপছন্দনীয় অহংকার ব'লে মনে করে। সঠিক অহংকারকে সহ্য করার ক্ষমতা বেঠিক অহংকারের নেই।

আল্লাহ আমাদেরকে সঠিকভাবে নামায পড়ার তৌফিক দান করুন।

আমিন!

লেখকের পরবর্তী বইঃ

১. কোরআনের আলোকে জ্ঞানতত্ত্ব (Theory of Knowledge)

২. কোরআনের আলোকে জ্ঞানের মনস্তত্ত্ব (Psychology of Knowledge)

৩. কোরআনের আলোকে অবিশ্বাসের স্বাধীনতা এবং ধার্মিকের কূপমণ্ডুকতা

৪. কোরআনের আলোকে তৃতীয় চোখ তথা জ্ঞানচক্ষু

৫. কোরআনের আলোকে মানুষের মূল্য

৬. কোরআনের আলোকে নাস্তিকের মনস্তত্ব

৭. কোরআনের আলোকে তাওহীদের মারেফত

৮. কোরআনের আলোকে সত্য কী

৯. কোরআনের আলোকে ধর্ম কী

১০. কোরআনের আলোকে ইসলাম কী

১১. কোরআনের আলোকে ঈসা (আ.) এর ক্রুশবিদ্ধ হওয়া এবং পুনরাবির্ভাব সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য

১২. কোরআনের আলোকে কালিমা তায়্যিবার মারেফত

১৩. কোরআনের আলোকে নামাজের গূঢ় রহস্য

১৪. কোরআনের আলোকে সাধনা এবং ধ্যান

১৫. কোরআনের আলোকে শ্রীমদ্ভগতগীতার বাণীরূপ ও মর্মকথার পর্যালোচনা

১৬. কোরআনের আলোকে কালিমা শাহাদার মারেফত

১৭. কোরআনের আলোকে সুখের মনস্তত্ব

১৮. কোরআনের আলোকে দুঃখ-কষ্টের উপকারিতা এবং সদ্ব্যবহার

১৯. কোরআনের আলোকে নারীর হিজাবের মনস্তাত্ত্বিক রহস্যোদঘাটন

২০. কোরআনের আলোকে সন্দেহের মূল্য

২১. ঈমান মানে আসল কী : কোরআনের আলোকে একটি বিশুদ্ধ পর্যালোচনা

২২. স্ত্রীর মন

২৩. কোরআনের আলোকে প্রেম, যৌনতা, ও বিবাহ

২৪. কোরআনের আলোকে মনের বর্জ্য-ব্যবস্থাপনা (Waste management for the Mind)

২৫. কোরআনের আলোকে ধৈর্যের শক্তি এবং তার সদ্ব্যবহার

২৬. কোরআনের আলোকে প্রতীকী ধ্যান

২৭. আল্লাহ মানুষকে কীভাবে পরীক্ষা করেন: কোরআনের আলোকে একটি পর্যালোচনা

২৮. কোরআনের আলোকে পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণসমূহ

২৯.কোরআনের আলোকে আইনের দর্শন

৩০.কোরআনের আলোকে নিউটনের আবিষ্কার

৩১.শরীয়তের মারেফত

৩২.অন্য ধর্মের কী হবে? কোরআনের আলোকে একটি পর্যালোচনা

৩৩.কোরআনের আলোকে জাতি-গঠনের উপাদান (Elements of Nation-Building)

৩৪. কোরআনের আলোকে নেতৃত্বের তত্ত্ব

৩৫.কোরআনের আলোকে অর্থনীতির তত্ত্বাবলীর পর্যালোচনা

৩৬.কোরআনের আলোকে 'আল্লাহ' নামের মারেফত

৩৭.কোরআনের আলোকে জেহাদের স্বরূপ

৩৮.ইবলিসের আত্মকথা

৩৯.কোরআনের আলোকে মৃত্যুর মনস্তাত্ত্বিক চিত্র

৪০.কোরআনের আলোকে মার্কসবাদের সার কথা

৪১.হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি কোরআনের ভাষ্য

৪২.বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রতি কোরআনের ভাষ্য

৪৩.খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের প্রতি কোরআনের ভাষ্য

৪৪.মানব দৃষ্টিতে কোরআনের বাক্যরীতির অসামঞ্জস্য এবং আত্মবিরোধ

৪৫.কোরআনের আলোকে মূর্তি কাকে বলে?

৪৬.মূসা (আ.): জ্ঞানতৃষ্ণার এক চিরন্তন প্রতীক

৪৭. কোরআনের আলোকে আমিত্বের বহু-রঙা পোশাক?

৪৮.কোরআনে ব্যবহৃত সর্বনাম ও কালবাচক শব্দের গূঢ় ইঙ্গিত

৪৯.কোরআনের আলোকে কোরআনের সত্যতার শত প্রমাণ

৫০.কোরআনের আলোকে আল্লাহর একত্বের শত প্রমাণ

৫১.কোরআনের আলোকে পার্থিব সুখ-সমৃদ্ধির সহজ পথ

৫২.কোরআনিক শব্দভাণ্ডারে সংস্কৃতের ছায়া

৫৩.কোরআনের আলোকে ভাগ্য তথা পূর্বনির্ধারণ

৫৪.নিশ্ছিদ্র ঈমান: কোরআনের আলোকে ঈমান বৃদ্ধির শত উপায়

৫৫.কোরআনের আলোকে ব্যবস্থাপনার তত্ত্ব (Theory of Management)

৫৬. কোরআনের আলোকে অপরাধ মনস্তত্ত্ব (Criminal Psychology)

৫৭.কোরআনের আলোকে উন্নয়ন অর্থনীতি (Development Economics)

৫৮.কোরআনের আলোকে পররাষ্ট্রনীতি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক (Foreign Policy and International Relations)

৫৯.কোরআনের আলোকে কোরআন নিয়ে গবেষণার বৈজ্ঞানিক রূপরেখা (A Scientific Framework for Doing Research on the Quran)

৬০.কোরআনের আলোকে ব্যবসা-বাণিজে সফলতার কৌশল (Strategies for Success in Business in Light of the Quran)

৬১.কোরআনের আলোকে শিক্ষণতত্ত্ব (Theory of Learning in Light of the Quran)

৬২.কোরআনের আলোকে ধারণার উৎস অনুসন্ধান (A Quest for the Origin of Concepts in Light of the Quran)

৬৩.কোরআনের আলোকে জ্ঞানের বর্জ্যের পুনর্ব্যবহার (Knowledge Recycling in Light of the Quran)

৬৪.কোরআনের আলোকে বিশ্লেষণী সৃজনশীলতার তত্ত্ব (Theory of Analytical Creativity in Light of the Quran)

৬৫.চিন্তাবিহীন চিন্তা (Thoughtless Thinking)

৬৬.কোরআনের আলোকে ব্যবস্থাপনার মনস্তত্ত্ব (The Psychology of Management in Light of the Quran)

৬৭.কোরআনের আলোকে নৈতিকতার দর্শন (The Philosophy of Ethics in Light of the Quran)

৬৮.কোরআনের আলোকে বহুকৃষ্টিবাদ (Multiculturism in Light of the Quran)

৬৯.কোরআনের আলোকে মালিকানার তত্ত্ব এবং মনস্তত্ত্ব (Theory and Psychology of Ownership in Light of the Quran)

৭০.কোরআনের আলোকে তথ্যপ্রযুক্তির তত্ত্ব (Theory of Information Technology in Light of the Quran)

৭১.বিদেহী প্রেমের পংক্তিমালা (আধ্যাত্মিক প্রেমের কবিতা)

৭২.মহাপ্রেম (আধ্যাত্মিক উপন্যাস)